হৃদয় জুড়ানো সালাত

শাইখ মিশারি আল-খাররাজ

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

হৃদয় জুড়ানো সালাত

শাইখ মিশারি আল-খাররাজ

বই :	হৃদয়জুড়ানো সালাত
লেখক :	শাইখ মিশারি আল-খাররাজ
ভাষান্তর :	আশিক আরমান নিলয়
সম্পাদনা :	মাহবুবা উপমা, আব্দুল্লাহ আমান
শারয়ি নিরীক্ষণ :	মুফতি আবুল হাসানাত কাসিম, মুফতি আবু উসাইম সারোয়ার
বানান ও ভাষারীতি :	মাহবুবুর রহমান, ওমর আলফারুক
প্রচ্ছদ :	সমকালীন গ্রাফিক্স টিম

হৃদয় জুড়ানো সালাত

সমকালীন প্রকাশন

হৃদয়জুড়ানো সালাত

শাইখ মিশারি আল-খাররাজ

প্রথম প্রকাশ

জুন ২০২২

মুদ্রণ

স্বরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

অনলাইন পরিবেশক

www.islamiboi.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com

একমাত্র পরিবেশক

লেভেল আপ পাবলিশিং

১১/১, পি কে দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-96509-6-6
Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 110.00 US $5.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ০১৪০৯-৮০০-৯০০

প্রকাশকের কথা

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে একজন মুসলিমের কমপক্ষে ১ ঘণ্টা সময় লাগে। এখন কোনো অবিশ্বাসী বস্তুবাদী মন চাইলে হিসেব কষে বের করে ফেলতে পারবে—তাহলে তো মুসলিমদের বিলিয়ন বিলিয়ন কর্মঘণ্টা ব্যয় হয়ে যায় এই এক সালাতেই। জ্ঞানবিজ্ঞান বা প্রগতিতে তারা অবদান রাখবে কীভাবে?

পৃথিবীকে জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ দেখিয়েছে এই মুসলিমরাই। তারা যেকোনো হিসাবেই আমাদের চেয়ে বেশি নামাজি ছিলেন। সালাত এবং অন্যান্য ইবাদতে নিরত থেকেই তারা পৃথিবী শাসন করেছেন। অতএব সালাত পড়ার কারণে নয়; আমরা বরং সালাত ঠিকমত আদায় না করার কারণেই পিছিয়ে পড়ছি।

সবাই কমবেশি হতাশ। কেউ সিনেমা-মিউজিক, কেউ-বা নেশায় মত্ত থেকে হতাশা ভুলে থাকতে চায়। ভুলে থাকা আর অতিক্রম করা এক নয়। তাই তো নেশা কেটে গেলে তাদের হতাশা আরো বেড়ে যায়। মুসলিমরা সালাতের মাধ্যমে হতাশাকে জয় করে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে করে আরো মজবুত।

আবদিয়ত বা দাসত্ব মানুষের রক্তে মেশানো। জগতের সবাই পূজায় ব্যস্ত। কেউ কল্পিত দেব-দেবীর, কেউ চন্দ্রসূর্যের, কেউ আগুন-পানির আর কেউ-বা উপাসনা করছে অন্যনামের ভিন্ন কিছুর। একমাত্র মুসলিমরাই সেই সত্তার ইবাদত করে, যিনি উপাসনার প্রকৃত হকদার। সালাতের সাথে তাই অন্যকিছুর আসলে তুলনাই চলে না।

দুঃখের কথা হলো, আমাদের সালাত হয়ে পড়েছে প্রাণহীন। ফলে আমরা আমাদের যাপিত জীবনে সালাতের প্রভাব দেখতে পাই না। সালাতের প্রাণ খুশুখুযু। সালাতে কীভাবে খুশুখুযু ফিরিয়ে আনা যায়, তা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে। খুশুখুযু ছাড়া সালাত যেন কেবল যান্ত্রিক ওঠাবসা। সালাতের প্রতিটি

পর্বে কীভাবে খুশুখুযু ধরে রাখা যায়, তার সংক্ষিপ্ত অথচ গোছালো এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রয়েছে এই বইয়ে।

সালাত মুসলিম-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ বিষয়ে আমাদের সবার বিস্তারিত জানা উচিত। সালাত বিষয়ে সমকালীন প্রকাশন থেকে *খুশুখুযু* এবং *হাইয়া আলাস সালাহ* নামে আরো দুটি বই ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। সালাত বিষয়ে পাঠকের চাহিদা পূরণে এই বইগুলো কাজে দিবে, ইনশাআল্লাহ।

সবার জন্য দরকারি এমন একটি বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। পাঠক উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ বই সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

সূচিপত্র

হৃদয় জুড়ানো সালাত

আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, সালাত আপনার জীবনে তেমন পরিবর্তন আনছে না যেমনটা আপনি চান? মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের অনেকেরই মনে হয়, সালাত আমাদের জীবনে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনছে না। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আমরাই আসলে সালাতের প্রতি সুবিচার করছি না! হতে পারে, সালাতের সাথে একেবারে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি অথবা আমাদের হয়তো কখনো শেখানোই হয়নি মনোযোগের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে। অথচ এই বিষয়টিই সালাতের প্রাণ। মনোযোগ বা একাগ্রতাহীন সালাত যেন যান্ত্রিক ওঠাবসা ছাড়া কিছুই নয়।

সালাতের একাগ্রতা কেমন হওয়া উচিত তা বুঝতে আমাদের পূর্বসূরিদের কিছু দৃষ্টান্ত খেয়াল করুন: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মুসলিমদের সাথে নিয়ে জিহাদের জন্য বেরিয়েছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে এটি যাতুর রিকা যুদ্ধ নামে পরিচিত। পথিমধ্যে সামান্য বিশ্রামের জন্য সবাই এক জায়গায় থামলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজন সাহাবিকে পাহারার দায়িত্বে থাকার আদেশ দিলেন। একজন আনসারি, আরেকজন মুহাজির। পালাক্রমে পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন দুজনে। একসময় মুহাজির সাহাবি বিশ্রামে গেলেন। আর আনসারি সাহাবি সালাতে দাঁড়ালেন পাহারারত অবস্থায়। দূর থেকে এক কাফির তাদের দিকে নজর রাখছিল। প্রহরীকে সালাত শুরু করতে দেখেই একটি তির ছুঁড়ে মারল সে। তিরটি এসে বিঁধল আনসারির শরীরে। সেটা শরীর থেকে টেনে বের করে সালাত চালিয়ে গেলেন তিনি। কাফিরটি দ্বিতীয়বার তির ছুঁড়ল। এবারও সাহাবি

আগের মতো শরীর থেকে তির বের করে সালাত পড়তে লাগলেন। একই ঘটনা ঘটলো তৃতীয়বারেও। অবশেষে আনসারি সাহাবি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে রক্তাক্ত অবস্থায় রুকু-সিজদায় চলে যান। ব্যাপারটা টের পেয়েই বিশ্রাম রেখে দৌড়ে আসেন তার মুহাজির ভাই। তাকে আসতে দেখে পালিয়ে যায় সেই হানাদার কাফির। মুহাজির বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আমাকে ডাক দিলেন না কেন?' আনসারির জবাব, আসলে প্রিয় একটি সুরার মাঝামাঝি ছিলাম। তিলাওয়াত থামাতে একটুও ইচ্ছে করছিল না।[১]

ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা। তিনি ছিলেন এক যুদ্ধের ময়দানে। তার চতুর্পার্শ্বে একের পর এক কামানের গোলা এসে পড়ছিল। কিন্তু তার মাঝে কোনো ভয়, অস্থিরতা বা অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছিল না। তিনি অবিচলভাবে সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন কিছুই হয়নি।[২]

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে একটি কথা প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে, ওযু করার সময় তার চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যেত। সালাতে রবের সামনে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করতেই থরথর করে কাঁপত তার শরীর।[৩]

আরেক সাহাবির সালাত সংক্রান্ত আশ্চর্যজনক ঘটনাও শোনা যায়। তিনি সালাত আদায় করছিলেন মসজিদে। এমন সময় মসজিদের একটি দেওয়াল সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়ে। কিন্তু সালাত শেষ করার আগে তিনি তা টেরই পাননি।[৪]

সালাত তো মানুষের অন্তরে এরকমই আনন্দ ও প্রশান্তির উদ্রেক করার কথা। কীভাবে এই মানুষগুলো তা অর্জন করলেন? আমাদের পক্ষেও কি সম্ভব ওই স্তরে পৌঁছা? কীভাবে সালাতকে যথাযথ কার্যকর করা যায়? এটিই আমরা শিখব এখন।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৯৮; *সহিহু ইবনি খুযাইমাহ* : ৩৬

[২] *তাহযিবু সিয়ারি আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৯৫

[৩] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৩৩

[৪] *আল-ফাতাওয়াল কুবরা*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২২; *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৬০৫; *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯০; উল্লিখিত সাহাবির নাম মুসলিম ইবনুল ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু।

দৃষ্টিভঙ্গি : প্রধান নিয়ামক

বাকি সবকিছু আপাতত ভুলে যান। প্রথমেই আসুন সালাতের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করি।

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন : কেন সালাত পড়ি? স্রেফ পড়তে হয় বলেই পড়া? কোনোরকমে দায়মুক্ত হওয়া? নাকি অন্য সবাই পড়ে বলেই পড়া?

সময় এসেছে এ ধরনের মানসিকতা পরিবর্তনের। এখন থেকে সালাত পড়া চাই একনিষ্ঠ ভালোবাসার বশে। পরম ভালোবাসার পাত্রের নিকটবর্তী হওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা থেকে। ভালোবাসার ব্যক্তিটির কাছে থাকতে পারলেই একধরনের শান্তি ও আরাম বোধ হয় না? ঠিক এই অনুভূতিটা পাওয়ার জন্যই সালাত পড়ুন। কাউকে ভালোবাসা হয় তিনটি কারণে—

» হয় ভালোবাসার পাত্র খুবই সুন্দর!

» অথবা তিনি আপনার সাথে সবসময় সদয় আচরণ করেন।

» আর নয়ত আপনার অনেক অনেক উপকার করেছেন তিনি।

এবার ভাবুন আল্লাহর কথা। ওপরের তিনটি বৈশিষ্ট্য তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো বটেই। তিনি এর থেকেও আরো অনেক বেশি কিছু। তাহলে আমাদের ভালোবাসার সবচেয়ে বেশি যোগ্য কি তিনিই নন? আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা মানে ভালোবাসার সর্বোত্তম স্বাদটি আস্বাদন করা! কেবল তাকে ভালোবাসার মাধ্যমেই লাভ করা যায় ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ।

আমরা জানলাম, ভালোবাসার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যও একপ্রকার প্রভাবক। তাই প্রথমে আসি আল্লাহর সৌন্দর্যের আলোচনায়। চারপাশে তাকিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকন করুন। হোক তা আত্মিক সৌন্দর্য বা বাহ্যিক। এগুলো সবই আল্লাহর মহাসৌন্দর্যের সামান্য নিদর্শন। ধরা যাক, প্রতিটি মানুষকেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো সুন্দর করে সৃষ্টি করা হলো। তবু সারা সৃষ্টিজগতের সামষ্টিক সৌন্দর্য আল্লাহর কাছে কিছুই নয়। এ যেন দুর্বল মোমবাতিকে সূর্যের প্রখরতার সাথে তুলনার চেষ্টা! আল্লাহর সৌন্দর্য তো সত্যিকার অর্থেই অদ্বিতীয়। আবার সাথে রয়েছে তাঁর চিরস্থায়ী মহিমা। একটু ভেবে দেখুন শুধু। আপনি সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ আপনার দিকে নিবিষ্ট হন।

দুনিয়ার চোখ দিয়ে আমরা আল্লাহকে কখনোই দেখতে পাব না। কারণ তাঁর সত্তার ঔজ্জ্বল্য এত বেশি, এত উর্ধ্বে যে কল্পনাও করা যায় না। তিনি তাঁর নুর সৃষ্টির কাছে উদ্ভাসিত করলে পুরো জগৎ একেবারে ভস্ম হয়ে যেত। মনে আছে মুসা আলাইহিস সালামের কী হয়েছিল? একবার, শুধু একবার তিনি দেখতে চেয়েছিলেন আল্লাহকে। সুমহান আল্লাহ বলেন—

...لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي...﴿١٤٣﴾

তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। তবে এ পাহাড়টির দিকে তাকাও। যদি এটা নিজ জায়গায় স্থির থাকতে পারে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।[১]

তারপর আল্লাহ পাহাড়ের ওপর তাঁর নুর আপতিত করেন। একেবারে বিলীন হয়ে যায় পুরো পাহাড়টি। আর মুসা আলাইহিস সালাম জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহর সৌন্দর্য আপতিত পাহাড়ের দিকে মুসা কেবল মুখ ফিরিয়েছিলেন, ফলে আল্লাহর নুর থেকে কেবল কনিষ্ঠ আঙুল পরিমাণ নুর প্রকাশিত হয়েছিল।[২] তাতেই এ অবস্থা। সরাসরি তাকালে কী হতো চিন্তা করুন!

এবার ভেবে দেখুন আমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কথা। কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করুন আর কৃতজ্ঞ হোন শুধু এই দৃষ্টিশক্তির জন্য। এভাবে প্রতিটা অনুগ্রহ গুনতে শুরু করলে কস্মিনকালেও গোনা শেষ হবে না। অথচ মনের মতো কোনো কিছু না পেলে আমরা মুখ কালো করে বসি, কেন আল্লাহ ওটা আমাকে দিলেন না! আল্লাহ যদি না দিয়ে থাকেন, তবে ওই অপ্রাপ্তিই আমার জন্য ভালো— এতটুকুও কি বুঝি না আমরা? জীবনে একটা পর্যায়ে গিয়ে ঠিকই বুঝে আসে, ওই অপ্রাপ্তিই ছিল সত্যিকারের অনুগ্রহ। কারণ আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।

ভাবুন একবার, গুনাহ করা কী পরিমাণ দুঃসাহসের কাজ! আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহ ব্যবহার করে তাঁরই অবাধ্যতা! এরপরও ভালোবাসা ও দয়াবশত তিনি সেসব অনুগ্রহ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন না। পাপাচারে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৩

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ১২২৬০; *জামিউত তিরমিযি* : ৩০৭৪; *মুসতাদরাক লিল হাকিম* : ৩২৪৯; হাদিসটি সহিহ।

আমাদের রক্ষা করে থাকেন তিনি। এর চেয়ে দয়ালু, এর চেয়ে দানশীল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসার হকদার আর কেউই হতে পারে না। মনে রাখবেন, ইহকালের প্রশান্তি আল্লাহকে স্মরণ করার মাঝে, আর পরকালের প্রশান্তি তাঁকে দেখার মাঝে।

তাই পরেরবার যখন সালাতে দাঁড়াবেন, ভালোবাসাবশত দাঁড়াবেন। সালাত পড়বেন, কারণ আল্লাহকে ছাড়া আপনার ভালো লাগছে না। খুব করে মনে চাইছে তাঁর নৈকট্য পেতে। এর জন্য যেন রীতিমতো তড়পাতে থাকে আপনার হৃদয়খানি। এই তবে শুরু হলো সালাতের সত্যিকার প্রশান্তি লাভের পথে আপনার যাত্রা।

সাক্ষাতের ঘোষণা

বলুন তো, সালাত কখন থেকে শুরু হয়? তাকবির তাহরিমা থেকে? উঁহু, এরও আগে। একেবারে আজানের সময় থেকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সালাতের জন্য অপেক্ষারত ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাগণ এ বলে দুআ করতে থাকে—হে আল্লাহ, আপনি তাকে মাফ করুন, আপনি তার ওপর রহম করুন।[১] আজান হলো আল্লাহর সাথে আসন্ন সাক্ষাতের ঘোষণা। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর যে ভীতি ও বিনয়, তা তখন থেকেই শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। তার মানে তখন থেকেই আপনার সালাত শুরু হয়ে গেছে।

আজান শয়তানকেও তাড়িয়ে দেয়। আজানের আওয়াজ শোনামাত্র সে রাগে গজগজ করতে করতে পালায়। শত্রু এখন আশপাশে নেই, এই চিন্তাই তো মনোযোগ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ফলে সালাতের প্রয়োজনীয় একাগ্রতাও চলে আসা উচিত।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, মনোযোগের অভাবে সালাতে যতটুকু সাওয়াব কমে যেত, আজান সে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ। কীভাবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আজান শুনে যতজন সালাতে আসে, মুয়াজ্জিন ততজনের সালাতের সাওয়াব পায়।[২] ধরুন, জামাতে শরিক হলো একশো জন মানুষ। মানে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬৫৯; *সহিহ মুসলিম* : ৬৪৯

[২] *সুনানুন নাসায়ি* : ৬৪৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৫০৬

মুয়াজ্জিন সে ওয়াক্তে পেলেন একশটি সালাতের সাওয়াব। আমরাও পেতে পারি সে সাওয়াব। কিন্তু আমরা তো মুয়াজ্জিন নই। তাহলে? এর জন্য আজানের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা চাই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শ, তারা (মুয়াজ্জিনগণ) যা বলে, তোমরাও তা-ই বলবে।[১] মক্কায় মসজিদুল হারামের আজানের জবাব দিলে কেমন হবে, ভাবুন একবার। সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসল্লি। আবার প্রতি রাকআতের সাওয়াব এক লক্ষ গুণ। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানশীলতা এমনই। ছোট্ট কাজ, বিশাল প্রতিদান।

আজানের শুরুও হয় 'আল্লাহু আকবার' (أَللّٰهُ أَكْبَرُ) দিয়ে। আল্লাহ সবচেয়ে মহান। তাঁর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কেউ নেই আপনার জীবনে। ব্যবসা-চাকরি-পরিবার-সন্তান-ঘুম সব ছেড়ে চলে আসুন এখন তাঁর কাছে রিপোর্ট করতে। মানুষ দুনিয়ার মিছে কোলাহলের পেছনে পড়ে ভুলে যায় আল্লাহর স্মরণ। তাই মুয়াজ্জিন প্রতিদিন এ কথাগুলো একাধিকবার করে বলে থাকেন।

কিন্তু এতসব ফেলে মসজিদে আসছি, কীসের জন্য? সব কাজ ফেলে সালাতে দাঁড়াচ্ছি কেন? তার উত্তর নিহিত পরের কথাগুলোতে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ)। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য না থাকার সাক্ষ্য। সবকিছু ফেলে আমরা সেই অদ্বিতীয় সত্তার কাছে আসছি। পক্ষান্তরে এ কথাকে অবজ্ঞা করার অর্থ যেন, হাতের কাজটাকে আল্লাহর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে সাক্ষ্য দেওয়া। ওই পার্থিব ব্যস্ততাই যেন ইবাদতের বেশি যোগ্য। কাজই যেন আমাদের উপাসনা!

মনে রাখতে হবে, আমরা সালাত পড়ব নবিজির অনুকরণে। তিনি বলেন, 'আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে পড়ো।'[২] আজানেও আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়ার পরের বাক্যে বলা হয় আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ); আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষক ও আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়ার ঘোষণা। আমরা মেনে নিচ্ছি, যেকোনো আমল করতে হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো নিয়ম অনুসারে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬১১; *সহিহ মুসলিম* : ৩৮৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬৩১; *সহিহ মুসলিম* : ১৫৬৭

তাকে পাঠিয়েছেনই মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক হিসেবে। তাই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে তাঁর পাঠানো শিক্ষকের শেখানো রীতি অনুযায়ী, একনিষ্ঠতার সাথে। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং রাসুলের দেখানো পদ্ধতির অনুকরণ এই দুই মূলনীতি যেকোনো আমলের গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত।

সুরা কাহফের শেষ আয়াতে এই মূলনীতিই বর্ণিত হয়েছে—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

বলুন, 'আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে ওহি এসেছে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে আর কাউকে অংশীদার না বানায়।[১]

এমনই মর্যাদা আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। আর কারো নামের মর্যাদা এত সমুন্নত করা হয়নি। পৃথিবী নামক এই পুরো গ্রহে ক্রমান্বয়ে একের পর এক স্থানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম অনবরত ঘোষিত হতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম এই গুণগান কর্মসূচিতে আপনিও অংশ নিন। পুনরাবৃত্তি করুন মুয়াজ্জিনের কথার।

সাক্ষ্য তো দেওয়া হলো। এরপর করণীয় কী? 'হাইয়া আলাস-সালাহ' (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ), সালাতের দিকে এসো। কিন্তু এখানে হুবহু এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি না করে বলতে হবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ), আল্লাহপ্রদত্ত শক্তিবলেই সালাতে যোগদান করা সম্ভব। এই যে সালাত পড়তে যাব, এই সামর্থ্যের যোগানদাতাও তো আল্লাহই। আজানেও ঠিক সুরা ফাতিহার ক্রম মানা হচ্ছে। সুরা ফাতিহাতে প্রথমে আমরা শুধুই তাঁর ইবাদত করার কথা বলি 'ইয়্যাকা না'বুদু' (إِيَّاكَ نَعْبُدُ), তারপর চাই সে ইবাদত করার সামর্থ্য 'ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন' (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)। সালাতের আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

---

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ১১০

আজানের পরের বাক্যটুকু মুমিনকে করে আনন্দে উদ্বেলিত আর আগ্রহে উদ্দীপ্ত। তা হলো কল্যাণের প্রতিশ্রুতি 'হাইয়া আলাল ফালাহ' (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ), কল্যাণের দিকে এসো। সালাতেই যেহেতু কল্যাণ, তাহলে কেন এটা ছেড়ে অন্য কাজ নিয়ে পড়ে থাকব? এবারও সেই কল্যাণ গ্রহণের সামর্থ্যদাতা আল্লাহ। তাই এবারও জবাব, লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আজান শেষ হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দিয়ে। 'আল্লাহু আকবার' আমাদের মনে করিয়ে দেয় দুনিয়াবি কাজ ফেলে মহান আল্লাহর কাছে আসার কথা। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ডাকে আখিরাতের জন্য কাজ করার দিকে।

তাই এখন থেকে আজান শুরু হলেই তা শুনবেন বহুল প্রতীক্ষিত কোনো ডাক শোনার মতো করে। প্রিয়তম সত্তার সাথে দেখা করার সময় চলে এসেছে। শিশু যেভাবে তার মায়ের পথ চেয়ে থাকে, আজানকেও নিজের অন্তরে সেভাবে প্রোথিত হতে দিন।

আজান নিজেও এক অনন্য নিয়ামত। কারণ, যে কেউ রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, রবও তার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন।[১] আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা আপনাকে প্রণোদিত করবে দেরি না করে সালাতে যেতে। ঠিক যেমনটি করেছেন মুসা আলাইহিস সালাম—

...وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

আমি দ্রুত আপনার কাছে এলাম, হে প্রতিপালক, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।[২]

কিন্তু আফসোস! অনেকের কাছে আজান এখন একঘেয়ে কিছু আওয়াজ। হঠাৎ করেই শুরু হয়, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় ব্যস্ত জীবনের কোলাহলে। অথচ আজানের কথাগুলোকে একটু মন দিয়ে লক্ষ করলে যাপিত জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে চলে আসতে পারত খুব দ্রুত পরিবর্তন।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬৫০৭

[২] সুরা ত-হা, আয়াত : ৮৪

আগে দর্শনধারী

ওযুর ব্যাপারে কিছু কথা না-বললেই নয়। আমরা অনেকে ওযু করি অনেকটা অভ্যাসবশত, যেন এতে তেমন বিশেষ কিছু নেই। মনে করি, এটি সালাতের আগের আবশ্যক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কিন্তু ওযু এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

ওযু কীভাবে করতে হয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে করেছেন, পানি অপচয় করা যাবে না ইত্যাদি তথ্য হয়তোবা আপনি ইতোমধ্যে জানেন। মুখ, মাথা, হাত, পা সব তো ধোয়া হচ্ছেই। অন্তর কোথায়? নিয়ত তো অন্তরেই থাকে। কত সাধারণ আটপৌরে কাজ মিযানের পাল্লা ভারি করে দেয় এই এক নিয়তের কারণে।

তাই অন্তর যখন কোনো কাজে মগ্ন হয়, তখন সত্যিকার অর্থেই ওই কাজ হয়ে ওঠে ওজনদার। অন্য সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্মিলিত সাওয়াবের চেয়েও বেশি উপার্জন করতে সক্ষম অন্তর। তাই এখন থেকে ওযুর সময় কেবল হাত-মুখ ধুয়েই ক্ষান্ত হবেন না; বরং নিয়তের মাঝে কিছু বিষয় যুক্ত করে জিতে নিন আকর্ষণীয় সাওয়াব। ওযু করতে যাবেন আল্লাহর আদেশ পালনের নিয়তে। সুরা মায়িদার ষষ্ঠ আয়াতে যেমনটি আছে—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...﴿٦﴾

হে ঈমানদারগণ, যখন সালাতের জন্য উঠবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে। আর মাথা মাসাহ করবে এবং দুই পা ধৌত করবে গোড়ালি পর্যন্ত।[১]

আরো নিয়ত রাখবেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণের।

নিয়ত করবেন মন্দ কর্মের আবর্জনা থেকে নিজেকে মুক্ত করার। পবিত্র না হয়ে আল্লাহর সাক্ষাতে যেতে নেই। ওযু বাহ্যিক ময়লা পরিষ্কার করে দেবে, যাতে এরপর সালাতে দাঁড়িয়ে অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করতে পারেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু

---

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৬

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে উত্তমরূপে ওযু করে, পানির শেষ ফোঁটা শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া পর্যন্ত তার গুনাহ ঝরে যেতে থাকে। অথবা এমনকি নখের নিচ থেকে পানি গড়িয়ে পড়া পর্যন্তও।[১] প্রতিটি অঙ্গের গুনাহ ঝরে পড়ে ওযুর ফলে। হাত, পা, মুখমণ্ডল, চোখ, মুখ। অদেখা এই পরিচ্ছন্ন প্রক্রিয়াকে কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করুন। দেখুন আল্লাহর রহমতের আশায় ভরা অন্তর নিয়ে। ওযু শেষে পাঠ করুন কালিমাতুশ শাহাদাহ। তারপর বলুন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

আল্লাহুম্মাজ' আলনি মিনাত্তাওওয়াবীন, ওয়াজ' আলনি মিনাল মুতাত্বহহিরীন

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে আপনার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।[২]

যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের আগেই মানুষ অনেক সময় লাগিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। সেখানে আপনি দেখা করতে যাচ্ছেন বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহর সাথে। ওযু আপনার রবের সামনে দাঁড়ানোর আগে নিজেকে পরিপাটি করে নেওয়ার অন্যতম মাধ্যম। ওযুর এই সৌন্দর্য আমাদের সঙ্গ দেবে আখিরাতেও। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইশ, যদি আমার ভাইদের দেখা পেতাম।[৩] এখানে তিনি বুঝিয়েছেন উম্মাহর পরবর্তী সময়ে আসন্ন প্রজন্মগুলোর কথা। অর্থাৎ, আমরা! বিচারদিবসে তিনি আমাদের চিনবেন চেহারায় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ওযুর চিহ্ন দেখে। তাই নবিজি আমাদের ওযুর অঙ্গগুলো ফরয অংশের চেয়েও বেশি করে ধুতে বলেছেন।[৪] যেমন : কনুই ও গোড়ালির একটু ওপর পর্যন্ত। এই অতিরিক্ত প্রচেষ্টায় শুধু গুনাহই মাফ হবে না, বেড়ে যাবে আমাদের মর্যাদাও।

ওযুর মর্যাদা অকল্পনীয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সকালে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তুমি জান্নাতে আমার আগে গেলে কী করে? জান্নাতে আমার সামনে সামনে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি। মানে সেবক যেভাবে

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৮১৫

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪; *জামিউত তিরমিযি* : ৫৫

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৫৭৯

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ১৩৬; এই কথাটুকু রাসুলের নয়; বরং আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর।

মনিবের সামনে সামনে চলে, সেরকম। বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আজান দেওয়ার পরপরই দুই রাকআত সালাত পড়ি। আর ওযু ছুটে যাওয়া মাত্রই আবার ওযু করে নিই।

ও, এ কারণেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করলেন।[১]

ওযু শেষ করেই আমরা কালিমাতুশ শাহাদাহ পড়ে জান্নাতের আটটি দরজাই নিজেদের জন্য খুলে নিই, যাতে ইচ্ছেমতো যেকোনোটি দিয়ে প্রবেশ করা যায়। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ)।[২]

তাকবিরে তাহরিমা কালে

আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে একটি কথোপকথন শুরু করি আমরা, যার নাম সালাত। আচ্ছা, কখনো কি ভেবে দেখেছেন, আমরা কেন আল্লাহু আকবার বলেই সালাত শুরু করি? এর বদলে সুবহানাল্লাহ কেন বলি না? কারণ আছে। আল্লাহু আকবার বলে আমরা সাক্ষ্য দিই যে, অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে আল্লাহর বড়ত্ব-মহত্ত্ব অনেক অনেক বেশি। তিনি আমাদের চাকরির চেয়ে বড়, আমাদের ব্যবসার চেয়ে বড়, ঘুমের চেয়ে বড়, টাকার চেয়ে বড়, পরিবারের চেয়ে, সন্তানের চেয়ে, শত কাজ আর ব্যস্ততার চেয়ে বড়। তাই আল্লাহু আকবার বলে আমরা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুটি হাত তুলি। পেছনে ছুঁড়ে ফেলি সেই সব পার্থিব ব্যস্ততাকে।

বান্দা সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ আদেশ দেন, আমার ও বান্দার মধ্যকার আবরণ তুলে দাও! যেই মুহূর্তে আপনি আল্লাহু আকবার ঘোষণা করেন, ঠিক তখন থেকে আল্লাহর চেহারা আপনার প্রতি পূর্ণরূপে নিবিষ্ট। আপনি বিমুখ না হলে তিনিও মুখ ফিরিয়ে নেন না। আপনার এই বিমুখতা শারীরিকও হতে পারে, হতে পারে আত্মিকও। হতে পারে আপনি এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অথবা হতে পারে আপনার মন ঘুরে বেড়াচ্ছে পার্থিব ব্যাপারে। এই বিমুখতা শুরু হওয়া মাত্রই

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১১৪৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৫৮

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৬৯; *জামিউত তিরমিযি* : ৫৫

আল্লাহ ডেকে বলেন, আমার চেয়েও উত্তম কিছুর দিকে মুখ ফেরাচ্ছ? আদেশ করেন আবারও সেই আবরণ নামিয়ে দেওয়ার।

মনে করুন, আপনার দিকে ঘুরে আছে ক্যামেরা। তাতে টকটকে লাল রঙের একটি বাতি জানান দিচ্ছে সরাসরি সম্প্রচার। কেমন লাগে তখন? সালাতে আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে সেই বাতিটি জ্বলে উঠেছে। কিন্তু আপনার দর্শক সাধারণ কোনো মানুষ নয়। সারা জগতের মালিক দেখছেন আপনাকে। আপনি সহ সবকিছু যার হাতে আছে ও চিরকাল থাকবে। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সারা জগত চলছে ও চলবে নিখুঁতভাবে। ছোটবড় কোনোকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। এবার বলুন, কেমন লাগছে সালাতে দাঁড়িয়ে। প্রবলভাবে ধুকপুক করছে না হৃদপিণ্ডটা?

আল্লাহু আকবার বলার পর এবার তিলাওয়াতের দিকে এগোচ্ছেন। আর আপনার দেহমন দিয়ে সংঘটিত প্রতিটি গুনাহ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে আপনার কাঁধে ও মাথায়। প্রত্যেকটি রুকু ও সিজদার সময় একে একে ঝরে পড়ে যাবে তারা।[১] স্বভাবতই রুকু-সিজদা লম্বা করার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা উচিত আমাদের।

একটু আগেও যেসব কাজ করা জায়িয ছিল, আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে সেগুলো হয়ে যায় নাজায়িয। খাওয়া, কথাবার্তা, অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া। হলোটা কী? কেন এই পার্থক্য? কারণ, এই পর্যায়ের এক সাক্ষাতে এ ধরনের কাজ অশোভন। দাস তার মনিবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এখন ওসবের সময় নয়।

এখনো মন এদিক-ওদিক যাচ্ছে? এজন্যই তো আমরা সালাতের প্রতিটি নড়াচড়ায় আল্লাহু আকবারের পুনরাবৃত্তি করি। এগুলো একেকটি স্মরণিকা। মনোযোগ পুনরুদ্ধারের নতুন নতুন সুযোগ।

রাজাকে সম্ভাষণ, শত্রুর বিতাড়ণ

'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনি সালাতে প্রবেশ করলেন। এবার দৃষ্টি অবনত রাখুন সিজদার জায়গায়। বাম হাতের ওপর ডান হাত

---

[১] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ১৭৩৪; হাদিসটি সহিহ।

রেখে বেঁধে রাখুন হৃদয়ের কাছাকাছি। কেন?

ধরুন একটি রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন আপনি। দূরে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কারো দৃষ্টি উদ্ধতভাবে সম্মুখ পানে আর হাত আরাম করে দুপাশে ছড়ানো। আরেকদল মানুষ আবার মাটির দিকে তাকিয়ে হাত দুটো এক করে ধরে আছে নিজেদের সামনে। দাঁড়ানোর এই ভঙ্গি দেখেই বুঝে যাবেন, কারা রাজপরিবারের লোক আর কারা সেবক। তাই না?

অতএব বান্দা হিসেবে রবের সামনে বিনয় সহকারে দাঁড়ানোই স্বাভাবিক। রবের সামনে দাঁড়ানোর চিন্তাটা মাথায় আসলে তো আপনা থেকেই বিনয় চলে আসার কথা। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সামনে বিনীত হওয়া মানে আসলে সম্মানিত হওয়া। কারণ এর ফলে মানুষ অন্য সব অযথা বিনয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর কাছে নিজেকে ছোট করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।[১]

এখনই সময় রাজাধিরাজকে যথাযথ সম্ভাষণ জানানোর, সানা পড়ার

মহামহিম আপনি, হে আল্লাহ! প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আপনারই তরে। আপনার নাম মহান, আপনার মর্যাদা সর্বোন্নত, আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক সানা শিক্ষা দিয়েছেন। যেকোনোটিই বেছে নিয়ে পড়া যায়। একেকটি সানা আমাদের সালাতে যুক্ত করে অনন্য একেকটি গুণ। তাই একেক সালাতে একেক সানা পড়লে এই পবিত্র মুহূর্তে মনোযোগ দেওয়া আরো সহজ হয়।

পাশাপাশি বিতাড়িত করতে হবে শত্রুকেও। এই পবিত্র মুহূর্ত, এই মহিমান্বিত সাক্ষাৎ দেখে হিংসায় দাউদাউ করে জ্বলে শয়তান। তার উদ্দেশ্যই হয়ে দাঁড়ায় প্রিয়তম রবের সাথে আপনার এই মুহূর্তগুলোকে চুরি করা, আপনাকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করা। সালাত শেষে তাই হয়ত দেখা যাবে আপনি পূর্ণ সাওয়াবের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বা এক-পঞ্চমাংশ কিংবা এমনকি এক-দশমাংশ পেয়ে বসে

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৮৮; *জামিউত তিরমিযি* : ২০২৯

আছেন। কারণ, সালাতে শুধু একনিষ্ঠ মনোযোগের অংশটুকুই কবুল হয়। হাশরের মাঠে কেউ কেউ আসবে নব্বই বছরের সালাত আদায়ের আমলনামা নিয়ে। কিন্তু প্রচণ্ড হতাশা ও বিস্ময় নিয়ে দেখবে সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়েছে মাত্র চার কি পাঁচ বছরের সালাতের জন্য।

এর কারণ শয়তান। দেখেন না ঠিক সালাতের সময়ই কেন যেন প্রতিটা দুনিয়াবি কাজ-কর্ম-ব্যস্ততা-চিন্তা হঠাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? দিনের পর দিন বা এমনকি মাসের পর মাস ধরে ভুলে থাকা জিনিস মনে পড়ে যায় সালাতে দাঁড়ানো মাত্রই। এমনকি জায়নামাযের আল্পনাগুলোও বলতে শুরু করে কত যে রঙবেরঙের গল্প! আপনি হয়তো লড়াই করে আবার মনোযোগ ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু শয়তান দমে যাওয়ার পাত্র নয়। নাকের কাছে ভনভন করা মাছির মতো বারবার ফিরে আসে সে।

তাহলে এর সমাধান কী? এই দুর্বল আমরা তাহলে কোন উপায় অবলম্বন করব? কার কাছে সাহায্য চাইব? সেই প্রিয়তম রবেরই কাছে! তাঁরই নাম নিয়ে তাঁরই সৃষ্টির অপকর্ম থেকে চাইব আশ্রয়। সালাত শুরুর আগেই তাই আত্মবিশ্বাস সহকারে বলব, আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। বলেই দেখুন না কেমন শক্তি ভর করে আপনার মাঝে!

সালাতের প্রাণ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি অভ্যাস ছিল। সালাতের ওয়াক্ত হলেই মুয়াজ্জিন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন, আমাদের প্রশান্তি দাও, বিলাল।[১] অর্থাৎ, আজান দাও। এটিই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রশান্তি। যেন কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে রাখার মাধ্যম। দুরূহ কোনো বিষয় বা দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হলেই সালাত অভিমুখী হতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কারণ, আল্লাহই তো বলেছেন—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ... ﴿٤٥﴾

আর সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে।[২]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৮৫; হাদিসটি সহিহ।

[২] সুরা বাকারা : আয়াত : ৪৫

একেকজন একেক পদ্ধতিতে দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। কেউ গান শোনে, কেউ করে যোগব্যায়াম, কেউবা দারস্থ হয় মাদকের। কিন্তু আমাদের মুসলিমদের জন্য এই চাহিদা পূরণ করে সালাত। আমরা ফিরে যাই সব সমাধানের আসল উৎস ও সর্বপ্রকার শান্তির মালিকের দ্বারে। সেই প্রিয়তম স্রষ্টার কাছে।

শয়তানকে বিতাড়িত করার পর এখন আমরা সালাতের প্রাণস্বরূপ অংশে প্রবেশ করতে চলেছি। সুরা ফাতিহা; কুরআনের মহত্তম সুরা। যে অংশটুকু ছাড়া কবুলই হয় না সালাত। যে অংশে আল্লাহ প্রতিটি আয়াতের জবাব দেন! অন্তত এই অংশে কীভাবে মনোযোগ হারানো সম্ভব, বলুন তো!

আচ্ছা, এক মিনিট। কোন জিনিসটা যেন আমাদের এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে? ও হ্যাঁ, আল্লাহর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও তাঁর নৈকট্য লাভের বাসনা। প্রিয়পাত্রের সাথে দেখা হলেই প্রথমে মানুষ কী উচ্চারণ করে? প্রিয়জনের সুমধুর নামের ধ্বনি। কিন্তু আমাদের প্রিয়জন তো যেনতেন কোনো সত্তা নন। তাঁর নামটিও নয় সাধারণ কোনো নাম। এ এমন এক নাম, যা তার আশপাশের সবকিছুকে বরকতময় করে দেয়। এ নামেতেই শুরু, এ নামেই শেষ, এ নামেই আস্বাদন করি আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের মিষ্টতা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ), আল্লাহর নামে যিনি পরম দয়াময় ও অতি দয়ালু। ঠোঁট ছুঁয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে এ কথাটি কীভাবে আপনার মনকে ঠান্ডা করে দেয়, অনুভব করেই দেখুন।

...لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ...﴿٢٤﴾

সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই [১]

ভালোবাসার পাত্র যে কত নিখুঁত, এই ভাবনায় মানুষ হাবুডুবু খেতে থাকে তাই না? আর বাস্তব অর্থে এই গুণের একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ। তাই 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন' (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ), সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ২৪

এই প্রশংসাবাক্যের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর অনস্বীকার্য ত্রুটিহীনতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ মিযানের পাল্লা পূর্ণ করে দেয়।'[১] তাই শুধু মৌখিক উচ্চারণ নয়; হৃদয়ের গহিন থেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। এছাড়াও কোনো সৃষ্টিকে ধন্যবাদ দেওয়া মানে আল্লাহকেই ধন্যবাদ দেওয়া। তিনিই তো সকল অনুগ্রহের আদি উৎস, তাই না? আরেকটু গভীরে ভাবুন। এই যে আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহর প্রশংসা করতে পারছি, এই সামর্থ্যটুকুও আল্লাহর দান। এটির জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতার দাবিদার। তার মানে আল্লাহ নিজেই নিজের প্রশংসা করাচ্ছেন আমাদের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ! দেখুন, আল্লাহর প্রতি আপনি কী পরিমাণ নির্ভরশীল। তাঁর প্রশংসা করতে পারার সামর্থ্যও আপনার আত্মাকে করছে পরিপুষ্ট।

আপন সীমানা ছাড়িয়ে যাত্রা

তো এতক্ষণে আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহর পরম ত্রুটিহীনতার সাক্ষ্য দিলাম। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম সবকিছুর জন্য। এবার পরের ধাপ।

জনপ্রিয় একটি পাওয়ার পয়েন্ট অ্যানিমেশান আছে। প্রথমে ছোট্ট একটি গাছের পাতার কোষের ভেতরের জগৎটা দেখানো হয়। তারপর দশ গুণ করে জুম আউট করে দেখানো হয় বাইরের জগৎগুলো। একে একে পৃথিবী, তারকারাজি, নভোমণ্ডল হয়ে অবিশ্বাস্য এ বিশ্বজগতের একটি চিত্র তৈরি করা হয়। এই একই কাজ এখন আপনি করবেন, তবে তা ওই পাতা থেকে শুরু হবে না। শুরু হবে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো এই আপনার নিজের প্রতিচ্ছবি দিয়ে।

প্রথমেই ভাবুন আপনার শরীরের ভেতরে সুনিপুণ শৃঙ্খলায় চলমান বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় তন্ত্রের কথা। রক্ততন্ত্র, রোগপ্রতিরোধতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, প্রাণরস, হৃদস্পন্দন, শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুকোষের চলাচল, ত্বকের কোষ, যকৃত, প্লীহা, রেচনতন্ত্র ইত্যাদি সবকিছু। তারপর বেরিয়ে আসুন আপনার চারপাশের জিনিসগুলোতে। মহাবিস্ময়কর উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎ, সাত সাগর, অতি তুচ্ছ পতঙ্গ আর অণুজীবের জগতে।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৫৫৬; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৫১৭;

এবার আরেক ধাপ বাইরে। অলৌকিক নিপুণতায় ভাসমান গ্রহ-উপগ্রহ ও সূর্যের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের সৌরজগতে। তারও বাইরে থাকা নক্ষত্রপুঞ্জ ও বিশ্বজগতে। তারও চিরকাল মানব-দানবের নাগালের বাইরে রয়ে যাওয়া অদেখা জগতে।

এখানেই শেষ নয় হয়তোবা। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের দৌড় অতটুকুই। তাই আবারও ধাপে ধাপে ফিরে আসুন সালাতরত নিজের কাছে। আল্লাহর সৃষ্টিযজ্ঞের সামনে নিজেকে কি একটি বিন্দুবিসর্গ বলেও মনে হচ্ছে আর? তাও তো মাত্র প্রথম আসমানের কথা বলা হলো। কুরআন আমাদের জানায়, এর বাইরে আরো ছয়টি আসমান আছে। আর এই সবকিছুতে শৃঙ্খলা রক্ষা করছেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ।

এখন কেমন লাগছে সেই প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে? কেমন লাগছে প্রতিটি আয়াতের জবাব পেয়ে? এখনো কি সাহস আছে তাঁর আদেশ অমান্য করার? এই উচ্চতার প্রতাপের অবাধ্যতা যে কত বড় দুঃসাহস, তা কি বুঝতে পারছেন এখন? কিংবা এই উচ্চতার ভালোবাসার অবমূল্যায়ন? পুরো সৃষ্টিজগতের মাঝে আমাদের মতো তুচ্ছ জিনিসকে তিনি বেছে নিয়েছেন সালাতের ওই প্রিয় বাক্যগুলো বলার জন্য। কতটা ভালোবাসা থাকলে কোনো সত্তা এরূপ করতে পারেন? এই যে আজানের জবাবে সালাতে দাঁড়ানোর মতো সাধ্যটুকু তিনি দিলেন, এটাই তো এক অকল্পনীয় অনুগ্রহ। কোন অজুহাতে তবে আমরা নিজেদের সেরাটা ঢেলে দেওয়া থেকে বিরত থাকি? এইরকম মর্যাদার হাতছানি উপেক্ষা করে কি আর জীবনের সালাত পরিত্যাগ করা সম্ভব?

যে প্রতাপের সামনে আমরা দাঁড়াচ্ছি, তার স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন, আল্লাহর আরশের পায়া (আল-কুরসি) পুরো আসমান-জমিনকে বেষ্টন করে আছে।[১] আর আল্লাহর কুরসির তুলনায় সপ্ত আসমান যেন মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটি। আবার আরশের তুলনায় কুরসিও অতটুকুই!

তাই এখন থেকে সালাতে দাঁড়ালে নিজেকে এভাবে দূর থেকে দেখবেন। তাহলেই বুঝে যাবেন রব্বিল 'আলামীনের সামনে দাঁড়ানোর আসল মানে।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫

ফাতিহার আরো কিছু গুপ্তধন

এখন আমরা এলাম 'আর-রহমানির রহীম' (الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ), পরম দয়াবান ও সতত দয়ালু অংশে। কখনো কি ভেবেছেন, কেন এটি 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ), বিচারদিবসের অধিকর্তা আয়াতের আগে এলো?

একটা দৃশ্য কল্পনা করুন। কোনো একটি অপরাধের তদন্ত চলছে। আপনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। শুরু হলো বিচারকার্য। আপনি নিরপরাধ। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিচারক আপনাকেও তলব করলেন। যেকোনোভাবে প্রশ্ন করতে পারেন তিনি।

শুরুতেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলা। ঘটনাস্থলে কেন ছিলেন? কী কাজ সেখানে? ঠিক কোন সময়ে পৌঁছেছিলেন? কী দেখেছেন? ইত্যাদি। আপনার হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার জোগাড়। আর নিতে পারছেন না আপনি। এমনসময় বিচারক আশ্বস্ত করে বললেন, যা-ই হোক। আমরা কিন্তু জানি, আপনি নিরপরাধ। কিন্তু আমাদের যথাসাধ্য তথ্য জোগাড় করা প্রয়োজন।

অথবা শুরুতেই আপনার নির্দোষ ঘোষণা করে তারপর প্রশ্ন শুরু করা। দেখুন, আমরা জানি আপনি নির্দোষ। তবে যদি তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে খুবই উপকৃত হই।

প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপনার বেশ নির্ভার অনুভূত হবে না? আর-রহমানির রহীম এর সাথে মালিকি ইয়াওমিদ্দীনের সম্পর্কটা এরকমই। বিচারদিবসে আপনার বিচার করবেন আর-রহমানির রহীম। এ কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিতে এ দুটো নাম আগে এসেছে। দয়াময়-দয়ালু নাম দুটো হৃদয়ে জ্বেলে দেয় প্রশান্তি আর নির্ভরতার আলো। ভয়াল সেই মহাদিবসে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর পূর্বপ্রস্তুতিই তো সালাতে দাঁড়ানো। তবে হ্যাঁ, আমরা যেন নিজেদের সেই দয়ার যোগ্য করে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে না ভুলি।

আর-রহমানির রহীম থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর দয়া সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে, ক্রোধ নয়। ইহকালে এই দয়া মুসলিম-কাফির, সদাচারী-কদাচারীসহ সকলেই পেয়ে থাকে। আল্লাহ সবাইকে আহার করান, পোশাক পরান, সুস্থ করেন। তাড়াহুড়ো করে শাস্তি না দিয়ে প্রচুর সময় দেন সুপথে ফিরে আসার। সম্পূর্ণ একটা জীবন, মৃত্যুর আগপর্যন্ত ফিরে আসার সুযোগ থাকে!

আল্লাহর দান যেমন তাঁর রহমত, তেমনি তাঁর না দেওয়াটাও রহমত। মাঝেমাঝে তিনি আমাদের কিছু কিছু অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেন। বিশ্বাস করুন, এটিই সত্যিকারের দান। কষ্টের ছদ্মবেশে রহমত। কিন্তু তা সাথে সাথে উপলব্ধি করার মতো প্রজ্ঞাটাই আমাদের নেই।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ... ﴿١٤﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি বুঝি জানবেন না?[১]

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

আর হয়তো তোমরা যা অপছন্দ করো, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যা ভালোবাসো, তা হয়তো অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।[২]

আর-রহমান হলো মমতার পূর্ণাঙ্গ রূপ। আরবিতে শব্দের গঠন এরকম হলে পূর্ণাঙ্গতা বোঝায়। যেমন গাযবান (غَضْبَان) ও গাযিব (غَاضِب) দুটো শব্দরই অর্থ ক্রোধান্বিত। আবার জাওআন (جَوْعَان) ও জা-ই (جَائِع) শব্দদ্বয়ের অর্থ ক্ষুধার্ত। কিন্তু গাযবান ও জাওআন দিয়ে যথাক্রমে একেবারে বেশি ক্রোধান্বিত ও একেবারে বেশি ক্ষুধার্ত বোঝায়, এর বেশি ক্রোধান্বিত বা ক্ষুধার্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আর-রহমান অর্থ আল্লাহ পরিপূর্ণ দয়াময়।

সত্যি বলতে, আল্লাহর সকল নামের মাঝে আর-রহমান নামটির পরিসরই সবচেয়ে বড়। আরশে সমুন্নত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি এ নামটিই উল্লেখ করেছেন।

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾

আর-রহমান আরশে সমুন্নত।[৩]

---

[১] সুরা মুলক, আয়াত : ১৪

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৬

[৩] সুরা ত-হা, আয়াত : ৫

এই মহান নাম কুরআনে বারবার উচ্চারিত হয়েছে মহান সৃষ্টি আল-আরশের সাথে। এ নামের ওপর আল্লাহর মালিকানা এতই একচ্ছত্র যে, অন্য কোনো সৃষ্টির নাম আর-রহমান হতে পারে না। মানুষের নাম আব্দুর রহমান (আর-রহমানের বান্দা) হয়, শুধু আর-রহমান হয় না। এই নাম কোনো সৃষ্টির রাখা যাবে না। আবার আল্লাহও কিন্তু নাম হয় না কারো। এই দুটো নাম একেবারেই তাঁর নিজস্ব।

আর আর-রহিম হলেন যিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া পৌঁছে দেন। কুরআনে কেবল মুমিনদের প্রতি দয়া করার ক্ষেত্রে এই নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ এবং মানুষের আসল স্বভাব সম্পর্কে যদি আমাদের ভালোভাবে জানা থাকত, তাহলে যেকোনো ব্যাপারে আমরা মানুষের দ্বারস্থ হওয়ার বদলে আল্লাহর স্মরণ নিতাম। আপন মায়ের চেয়ে যে আল্লাহর ভালোবাসা বেশি, এটা জানার পর আর কীইবা বাকি থাকে? সকল প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি ক্রোধের পরিবর্তে দয়া দিয়ে সবকিছুকে শাসন করেন।

হৃদয়ের ভার সরিয়ে ফেলুন আর-রহমানির রহীমের ছন্দে।

একটু ঝাঁকুনি

তারপর আসে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ), বিচারদিবসের অধিপতি। মালিক (অধিপতি, সার্বভৌম, কর্তা) শব্দটি কেন বেছে নিলেন আল্লাহ? কারণ ইহকালে সৃষ্টিকে যাও বা কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, কিয়ামতের পর তা একেবারেই ছিনিয়ে নেওয়া হবে। সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ। এমনকি তাঁর অনুমতি পাওয়ার আগে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না কেউ, কারো নামে সুপারিশ করা তো দূর কি বাত! আর এই শব্দটির দুইরকম কিরাআত আছে। মা-লিকি (মালিকানা অর্থে) এবং মালিকি (রাজত্ব অর্থে)। দুটিই এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলার একক আধিপত্যের সেই দিনটি কতটা ভীতিকর, তা জানা যায় বহু আয়াত থেকে—

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে...যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেওয়া হবে...যখন তারকারাজি নিষ্প্রভ হয়ে খসে পড়তে থাকবে...যখন পাহাড়গুলো মিলিয়ে যাবে...যখন সাগর ফুটতে শুরু করবে...পৃথিবী যখন প্রকম্পিত হবে...পশুপালকে যখন জড়ো করা হবে...যখন কবরগুলো উলটে দেওয়া হবে।' [সুরা তাকভির, ইনফিতার, ইনশিকাক, ফাজর]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

যখন মানুষ পালিয়ে বেড়াবে তার নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে, মায়ের ও বাবার কাছ থেকে, আপন সঙ্গী ও সন্তানের কাছ থেকে।[১]

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

সেদিন দেখবেন স্তন্যদাত্রী মা তার কোলের শিশুকে ভুলে যাবে, গর্ভপাত হয়ে যাবে গর্ভবতীদের। মনে হবে যেন পুরো মানবজাতি মাতাল, অথচ আসলে তারা তা নয়; বরং আল্লাহর শাস্তিই প্রচণ্ড।[২]

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ... ﴿١٠٤﴾

সেদিন আমি আকাশগুলোকে গুটিয়ে নেব কাগজের মতো।[৩]

...وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ... ﴿٦٧﴾

আর আকাশসমূহ গুটিয়ে নেওয়া হবে তাঁর ডান হাতে।[৪]

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ... ﴿٦٨﴾

আর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং আসমান-জমিনের সবকিছু হয়ে যাবে সংজ্ঞাহীন।[৫]

---

[১] সুরা আবাসা, আয়াত : ৩৪

[২] সুরা হজ, আয়াত : ২

[৩] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৪

[৪] সুরা যুমার, আয়াত : ৬৭

[৫] সুরা যুমার, আয়াত : ৬৮

বাকি থাকবে কে? শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া ফেরেশতা। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রাণও নিয়ে নেবেন। আর কে বাকি? কেউ না। আমাদের প্রতিপালক ডেকে বলবেন, আজ রাজত্ব কার? কোনো উত্তর নেই। কার রাজত্ব আজ? উত্তর নেই। রাজত্ব কার? সুনসান নীরবতা। আল্লাহ তারপর নিজেই ঘোষণা করবেন, অদ্বিতীয় ও সর্বক্ষমতাময় আল্লাহর।[১]

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿١٣﴾

তারপর (শিঙ্গায়) দ্বিতীয় ফুৎকার ধ্বনিত হবে। তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাবে।[২]

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا... ﴿٦٩﴾

আর জমিন উদ্ভাসিত হবে তার প্রতিপালকের নুরে।[৩]

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ... ﴿٢٣﴾

আর আপনার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন, তাঁর ফেরেশতারা দাঁড়াবে সারিবদ্ধ হয়ে আর সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে।[৪]

মাথার কাছে সূর্য চলে আসবে এমন এক দিনে, যার দৈর্ঘ্য ৫০ হাজার বছরের সমান! এই ভয়াবহতা থেকে মুক্তির উপায় কী? উত্তর সামনে আসছে।

তার আগে আরো একবার মালিকি ইয়াওমিদ্দীনের সত্যিকার প্রতিচ্ছবিটি ভাবুন। সালাতে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে একটু থামবেন। বধির ও নির্বোধের মতো পার করে যাবেন না এই অংশটি। কারণ মুমিনের হৃদয় তো আশা ও ভয়ের মাঝে দুলতে থাকে। আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভয়।

---

[১] সুরা গাফির, আয়াত : ১৬

[২] সুরা যুমার, আয়াত : ৬৮

[৩] সুরা যুমার, আয়াত : ৬৯

[৪] সুরা ফজর, আয়াত : ২২

মুক্তির চাবিকাঠি

মালিকি ইয়াওমিদ্দীন আয়াতের স্বরূপ বুঝতে পারলে আসলেই ভয়ে কেঁপে ওঠার কথা। অথচ অনেকে রীতিমতো আনমনে আওড়ে চলে যান আয়াতটি। কথাগুলো হৃদয়ে পৌঁছে না। মুখস্থ বুলির মতো চলতে থাকে।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[১]

সালাতে যাদের সত্যিকার অর্থে মনোযোগ থাকে, তারা সালাতে শান্তি পায় পানিতে থাকা মাছের মতো। আর যাদের মনোযোগ থাকে না, তারা যেন খাঁচায় বন্দি পাখির মতো অস্থির।

তো সেই ভয়াবহ দিনে রক্ষা পাওয়ার কী উপায়? উত্তর আছে পরের আয়াতেই। পুরো কুরআনের সারমর্ম যে সুরা ফাতিহা, সেই সুরার সারমর্ম এই আয়াত। 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ), আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং সাহায্যও চাই কেবল আপনারই কাছে।

প্রত্যেক নবি নিজ নিজ উম্মাতকে নাজাতের এই চাবি দিয়ে গেছেন—

إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

আমি তোমাদের কাছে এসেছি সুস্পষ্ট সতর্ককারী হিসেবে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না। তোমাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির ব্যাপারে সত্যিই আশঙ্কা হয়।[২]

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য তাহলে কী হওয়া চাই? শুধু এবং শুধুই আল্লাহর ইবাদত। আমাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে এ কাজের জন্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম? আল্লাহর

---

[১] সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪

[২] সুরা হুদ, আয়াত : ২৫-২৬

সাহায্য কামনা।

আর ইবাদতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি? অন্তরের একনিষ্ঠতা। আমরা যা করছি এবং যা করব সবই শুধু আল্লাহর জন্য আর কারো জন্য নয়। তাঁর সন্তুষ্টিই একমাত্র কাম্য। নিয়তের এই বিশুদ্ধতা ছাড়া ইবাদত করা মানে বালুর বস্তা নিয়ে ভ্রমণে বের হওয়া। কাঁধে প্রচুর ওজন, কিন্তু সবটাই অযথা বোঝা।

কেবল আল্লাহকে আপনার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানান; মানুষকে নয়। তারা কী ভাবল বা বলল, তা বিবেচ্যই নয়। এতে আপনার না কোনো ক্ষতি হবে, না উপকার। অমুক কাজটি কেন করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে যেন আপনি দৃঢ়ভাবে বলতে পারেন, আল্লাহর জন্য। মানুষ বলবে, না, সেটা তো ঠিক আছে। আর কীসের জন্য? একই রকম প্রত্যয়ে বলবেন, আর কিছুর জন্যই নয়।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

বলুন, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, কাজের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় অভাগা কারা? এই জীবনের সকল প্রচেষ্টা যাদের বৃথা হয়ে গেছে, অথচ তারা ভাবছিল কতই না ভালো কাজ করছে।[১]

আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ একাগ্রতা আপনার জীবনটাই পালটে দেবে। তাই প্রতিটি কাজে নিয়ত পরিশুদ্ধ করে নিন। সন্তানদেরও বুঝিয়ে দিন যে, যেকোনো কাজ তারা করতে শিখবে আল্লাহ সেটা পছন্দ করেন বলে। আর যেকোনো কাজ থেকে বিরতও থাকবে সেটা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় বলে। তারা যেন জেনে যায় যে, পুরস্কারদাতা শুধু আল্লাহ। মানুষ নয়।

তবে বিশুদ্ধ নিষ্ঠা ও নিয়ত অত সোজা নয়, এটা সত্য। তাই বলে অসম্ভবও তো নয়। কারণ আমাদের শেখানো হয়েছে এক জাদুমন্ত্র, ‘ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা‘ঈন (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) আর সাহায্যও চাই আপনারই কাছে।’ আল্লাহ সাহায্য করলে কিছুই আর অসম্ভব থাকে না। সবই আল্লাহর হাতে। স্রেফ চেয়ে নিন, তিনি দিয়ে

---

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ১০৩-১০৪

দেবেন। তিনি তো বলেই দিয়েছেন, আমি যাকে সুপথে চালাই, সে ছাড়া তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট।[১]

ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন এমন এক আয়াত, যা নিয়ে আমাদের সৎকর্মশীল পূর্বসূরিগণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কান্নাকাটি করতেন। জনৈক সালাফ একবার সালাত আদায় করছিলেন মসজিদুল হারামে। এই আয়াতটা বারবার পড়তে পড়তে কাঁদছিলেন তিনি। সেসময় কাবা তাওয়াফ করতে গেলেন তাঁর এক বন্ধু। তাওয়াফ শেষ করে ফিরে এসে দেখেন এখনো তিনি ওই আয়াত পড়ছেন আর কাঁদছেন। এরকম করতে করতেই সূর্যোদয়ের সময় চলে আসে।

তাই 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন' দিয়ে অন্তরের সব মুনাফেকির ময়লা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলুন।

শ্রেষ্ঠতম দুআ

জীবনে যত দুআ করা সম্ভব, তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও গভীর দুআটি এখন চলে এসেছে।

'ইহদিনাস-সিরাতাল মুস্তাক্বীম' (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ), আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন।

আমাদের সরল পথে পরিচালিত করার অর্থ হলো যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত করার ব্যাপারে সাহায্য করা। মনে আছে, আগের আয়াতেই যে আমরা সাহায্য চাওয়ার কথা বলেছিলাম?

খেয়াল করুন, সুরা ফাতিহা আমাদের শেখাচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরার আদব-কায়দা। শেখাচ্ছে কীভাবে দুআ করলে আল্লাহ শুনবেন এবং জবাব দেবেন।

মহাসম্মানিত সত্তার সাথে কথাবার্তা যেভাবে শুরু করা উচিত, এখানেও তা-ই করা হয়েছে। প্রশংসা দিয়ে শুরু। তারপর অনুরোধ।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৭৭; *জামিউত তিরমিযি* : ২৪৯৫

তো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথটিকে বলে আস-সিরাতাল মুস্তাক্বীম, সরলসোজা পথ। কিন্তু কোনো সাহায্য ছাড়া এ পথে অবিচল থাকা সহজ নয়।

কারণ এ পথ সম্পর্কে কিছু কিছু বিষয় আমরা জানি, আবার কিছু জানি না। অর্থাৎ, কোনটা হালাল, কোনটা হারাম। কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ। সত্যি বলতে জানার চেয়ে অজানার পরিমাণই বেশি।

আবার জানা বিষয়গুলোর মধ্যেও কিছু জিনিস আমাদের সাধ্যের মধ্যে, কিছু সাধ্যাতীত। যেমন : হজ, সিয়ামের মতো আর্থিক ও কায়িক শ্রমসাধ্য বিষয়গুলো।

যেগুলো সাধ্যের ভেতর, সেগুলোরও কোনো কোনোটি কঠিন বলে মনে হতে পারে। যেমন : ফজরের ওয়াক্তে ঘুম থেকে ওঠা।

কোনোমতে কঠিন কাজগুলো করে ফেললেও আবার তাতে থাকতে পারে নানারকম ত্রুটিবিচ্যুতি। হয়তো মনোযোগের অভাব ছিল বা সুন্নাহ ঠিকমতো আদায় করা হয়নি।

ওপরের সব শর্ত পূরণ করে ফেললেও আরেকটা জিনিস অবশ্যই লাগবে; অবিচলতা। প্রতিবার প্রতিটি কাজ ঠিকঠাকভাবে করার সামর্থ্য।

দেখলেন তো, কেন সরলপথে চলতে আল্লাহর সাহায্য আমাদের এতটা প্রয়োজন? বুঝলেন, কেন তাঁর সাহায্য ছাড়া চলা অসম্ভব? এখান থেকেই কি বোঝা যাচ্ছে না যে, এই দুআটি কতটা ব্যাপক?

আমরা জানি, সিরাত বা পথ দুটো। একটি এই দুনিয়ায়, যার কথা ওপরে বলা হলো। আরেকটি হলো আখিরাতের সেই পুলসিরাত, যা মারাত্মক সরু আর তরবারির চেয়ে ধারালো। জাহান্নামের ওপর স্থাপিত এই সেতু আমাদের সকলরেই পার হতে হবে। এর অপর পাড়েই জান্নাত।

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

প্রত্যেককে এটি পার হতে হবে। এটি আপনার প্রতিপালকের নির্ধারিত বিধি, যা বাস্তবায়িত হবেই। অতঃপর যারা আল্লাহকে ভয় করেছিল, তাদের রক্ষা করব আমি। আর পাপাচারীদের সেখানেই ফেলে রাখব নতজানু অবস্থায়।

[সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৭১-৭২]

ইহজীবনের সিরাতে অবিচল থাকতে পারলে পরকালের সিরাতও সহজ হয়ে যাবে। তাই দ্বিতীয়টির সাফল্য সরাসরি নির্ভরশীল ইহকালের ঈমান ও আমলের পরিমাণের ওপর। বিচারদিবসের আঁধার আর সেই সেতুর আতঙ্কের মাঝে আমাদের ঈমান আর আমল হবে পথপ্রদর্শক বাতি।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم...﴿١٢﴾

সেদিন দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের নুর তাদের সামনে ও ডানে আগে আগে চলছে।[১]

তাই কেউ পার হবে বিদ্যুৎগতিতে। কেউ উল্কাবেগে। কেউবা বাতাস আর কেউ ঘোড়ার গতিতে। দৌড়েও পার হবে কেউ। কারো কারো যেতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে। আর কেউ কেউ ব্যর্থ হয়ে পড়ে যাবে নিচে। প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরিয়া হয়ে সুপারিশ করতে থাকবেন, প্রতিপালক, ওদের বাঁচান! ওদের রেহাই দিন, হে প্রতিপালক...[২]

ইহকালের সিরাত আমাদের পৌঁছে দেবে আল্লাহর কাছে। আর পরকালের সিরাত নিয়ে যাবে সোজা জান্নাতে।

বুঝতে পারছেন তো দুআটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? আমাদের পুরো অস্তিত্ব 'ইহদিনাস সিরাত্বল মুস্তাক্বীম'-এর ওপর নির্ভরশীল। এই বাস্তবতা জেনে যখন আমিন বলবেন, তখনই কেবল তা অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে আসবে। আসলে যেকোনো দুআ কবুল হওয়ার জন্যই এটি শর্ত। একাগ্র অন্তর থেকে আসতে হবে সেই দুআ। কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অমনোযোগী অন্তর থেকে আসা দুআর জবাব আল্লাহ দেন না।[৩]

আল্লাহ আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন, আমিন।

---

[১] সুরা হাদিদ, আয়াত : ১২

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৩২৯; *সহিহুল বুখারি* : ৬৫৭৩

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৪৭৯; হাদিসটি হাসান তথা গ্রহণযোগ্য।

ফাতিহার সমাপ্তি

আস-সিরাত্বল মুস্তাক্বীম নিয়ে এতক্ষণ কথা হলো। আল্লাহর সাহায্যে এতে অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা চাই। তাহলেই আসবে দুজাহানের মুক্তি। এবার সূরা ফাতিহাকে বিদায় জানানোর পালা।

কথায় বলে; সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। তাই আগের দুআটিকে আরো বিশেষায়িত করে আমরা এবার বলছি, সিরাত্বল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ); তাদের পথ, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন।

পূর্বসূরি সকল সৎকর্মশীল নরনারী এর অন্তর্ভুক্ত। নবি, সাহাবি, নেককার এবং সর্বোপরি আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা যে চরম কষ্ট ভোগ করে সরলপথে অবিচল থেকেছেন, সে স্মৃতি আমাদের সান্ত্বনা। নিজেদের দুঃখকষ্ট এতে হালকা হয়ে যায়। স্বস্তি পাই এই জেনে, ইনশাআল্লাহ অন্তহীন আখিরাতে এই মানুষগুলোর সঙ্গী হব আমরা।

গইরিল মাগদ্বূবি আলাইহিম (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ); যাদের প্রতি ক্রোধ আপতিত, তাদের পথ নয়। এরা হলো এমন লোক, যারা সত্য-সঠিককে ভালো করেই চেনে। তারপরও ইচ্ছে করেই তা প্রত্যাখ্যান ও অমান্য করে। জানে, কিন্তু মানে না। যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয জেনেও অনেকে পড়ে না।

ওয়ালা-দ্ব দ্ব-ল্লীন (وَلَا الضَّالِّينَ); তাদের পথও নয়; যারা পথভ্রষ্ট। এই ধরনের মানুষেরা জানেও না, জানতে চেষ্টাও করে না। তাই তারা মানে, কিন্তু ভুল পথে। যেমন : ভুল নিয়মে সালাত আদায়কারী।

নিয়ামত বা অনুগ্রহের ব্যাপারটি আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আনআমতা আলাইহিম (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ), আপনি অনুগ্রহ করেছেন। পক্ষান্তরে ক্রোধ ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে এরকম কোনো সর্বনামের উল্লেখ নেই। কারণ অনুগ্রহদাতা একমাত্র আল্লাহ। আর পাপাচারে লিপ্ত হলে সারা সৃষ্টিজগতের ক্রোধ উপার্জিত হতে থাকে। ফেরেশতাদের, নবিগণের ক্রোধ, সৎকর্মশীল বান্দাদের ক্রোধ ইত্যাদি।

আমীন অর্থ, হে রব, গ্রহণ করে নিন, উত্তর দিন (আমার প্রার্থনার)। আমীন বলে

আমরা প্রার্থনা করছি সেই সত্তার কাছে, যার হাতে আমাদের হিদায়াত, সাফল্য আর নাজাত।

তাই আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন খোলাখুলি বলুন। ফাঁসির আসামি যেভাবে বাদী পরিবারের কাছে প্রাণভিক্ষা করে, সেভাবে। কণ্ঠে থাকবে মরিয়া ভাব, অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

প্রাণভরে 'আমীন' বলার আরেকটি কারণ আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার 'আমীন' আসমানের ফেরেশতাদের 'আমীন' এর সাথে মিলে যাবে, আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।[১]

তাই সালাতে মন হারানোর কোনো কারণই থাকতে পারে না। এত ভালো জিনিস হারাতে চাইবে না কেউ। আমাদের হৃদয় একাগ্র ও জীবিত হওয়া চাই।

আগেও বলা হয়েছে, সুরা ফাতিহা সালাতের অন্তর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি খুঁটি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সুরা ফাতিহা পড়েনি, তার সালাতই হয়নি।[২] আল্লাহ এ সুরার প্রতিটি আয়াতের জবাব দেন। কীভাবে? চলুন, শোনা যাক।

আল্লাহ বলেন, 'আমি সালাতকে আমি এবং বান্দার মাঝে ভাগ করে নিয়েছি। আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে।'

সে যখন বলে, 'সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।' আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।'

বান্দা যখন বলে, 'পরম করুণাময় ও সতত দয়ালু।' আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে।'

সে যখন বলে, 'বিচারদিবসের অধিপতি।' আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব ঘোষণা করেছে বা আমার বান্দা সবকিছু আমার কাছে সমর্পিত করেছে।'

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭৮০; *সহিহ মুসলিম* : ৪১০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৭৫৬; *সহিহ মুসলিম* : ৩৯৪

সে যখন বলে, 'আমরা শুধু আপনার উপাসনা করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।' আল্লাহ বলেন, 'এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। সে যা চাইবে, তা-ই পাবে।'

সে যখন বলে, 'আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন। তাদের পথ, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের নয়, যাদের প্রতি আপতিত হয়েছে ক্রোধ। তাদেরও নয়, যারা পথভ্রষ্ট।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটি আমার বান্দার জন্য। আর বান্দা যা চেয়েছে তা-ই পাবে।'[১]

তাই এখন থেকে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াতের সময় প্রতি আয়াতের পর একটু করে থামবেন। এমনটিই করতেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কারণ মহাপ্রতিপালক আপনার প্রতি নিবিষ্ট হয়ে জবাব দিচ্ছেন। দৃশ্যটি অন্তর দিয়ে অনুভব করে দেখুন। তাঁর দাস হওয়াটা কতই না মর্যাদার ব্যাপার!

অন্তর থেকে তিলাওয়াত

সুরা ফাতিহা শেষ করলাম। এরপর আসবে কুরআনের অন্য কোনো অংশের তিলাওয়াত।

খেয়াল করেছেন, সালাতে কুরআন তিলাওয়াত সবসময় দাঁড়ানো অবস্থায় করা হয়? বসা, রুকু, বা সিজদা অবস্থায় নয়। কেন?

দাঁড়ানো অবস্থা হলো সবচেয়ে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। কুরআনের বাণী সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কথা। সম্মানের স্থান থেকেই তাই সম্মানের এসব উক্তি উচ্চারণ করা উচিত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রুকু ও সিজদাকালে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২]

কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী। সর্বোচ্চ সম্মানের হকদার। কিন্তু জীবনে কতবারই না আমরা এই শক্তিশালী কথাগুলো আওড়ে গেছি একদম অন্যমনস্কভাবে, কোনো আবেগ-অনুভূতি ছাড়াই! যে কাউকে জিজ্ঞেস করুন, এই মাত্র যে আয়াতটা পড়লেন,

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৩৯৫; *জামিউত তিরমিযি* : ২৯৫৩;

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৪৭৯,৪৮০

সেখানে একটি বিধানের কথা ছিল। কী যেন সেটা? অনেকেই পারবে না উত্তর দিতে। ইমাম জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা তিলাওয়াত করতে থাকেন। আর পেছনে মুসল্লিরা ভাবতে থাকেন খাবার আর পানীয়ের কথা।

প্রতাপশালী কোনো শাসকের সাথে ঐতিহাসিক কোনো সাক্ষাৎকারের কথা কল্পনা করুন। কতটা মনোযোগী হওয়ার কথা শ্রোতার? শুধু কান নয়; মন দিয়ে শোনা হতো সব কথা। বরং এত মনোযোগ থাকার কথা যে, রীতিমতো মুখস্থ হয়ে যাবে শাসকের প্রতিটি বাক্য। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথাগুলোতে মনোযোগ না দেওয়া তাহলে কীভাবে সম্ভব?

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[১]

আমাদের অন্তর যদি যথাযথভাবে পরিষ্কার থাকত, তাহলে কখনো আল্লাহকে ভুলতেই পারতাম না। মনে রাখবেন, তিলাওয়াতের পরিমাণ নয়; মান বিবেচ্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার অশ্রুভেজা নয়নে একটি আয়াত তিলাওয়াত করেই সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তো তারা আপনারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা করে দেন, আপনি তো এমনিতেই মহাশক্তিধর ও প্রজ্ঞাবান।[২]

তাই তিলাওয়াতের সময় ভালো করে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক কথোপকথন চলছে। তবে কোন আয়াতে কেমন অনুভূতি হতে হবে, তা বুঝব কীভাবে? ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে একটি সাধারণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। প্রতিটি আয়াতের তাফসির জানা না থাকলেও চলবে। তিনি বলেন—

[১] সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪

[২] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৮

আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ, নাম ও বৈশিষ্ট্যের কথা থাকলে অন্তরকে ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও জান্নাতবাসীদের আলোচনা থাকলে অন্তরে আনতে হবে আনন্দ, প্রশান্তি ও আশা।

আর আল্লাহর শাস্তি, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সংক্রান্ত আয়াত হলে ভীতি ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আসতে হবে অন্তরে।[১]

অতএব আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত মানেই ভালোবাসা, আশা ও ভয়ের মাঝে দুলতে থাকা। কুরআন আমাদের জ্ঞানের চেয়েও মহান

لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

এ কুরআন যদি পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে দেখতেন যে তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও চূর্ণ হয়ে গেছে। মানুষ যাতে চিন্তাভাবনা করে, তাই আমি এসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি।[২]

প্রাণভরে চাওয়া

তিলাওয়াত শেষ করতে করতে আবারও মনোযোগ ছুটে গেছে? সমস্যা নেই। রুকুতে যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে আবারও নিজেকে মনে করিয়ে দিন আল্লাহর বড়ত্বের কথা।

এই যে আমরা মাটিতে সালাত আদায় করছি, আর আল্লাহ আমাদের দেখছেন সপ্ত আসমানের ওপর থেকে। তাই সালাত তো এমনিতেই সুন্দর হওয়া উচিত, বিশেষত রুকু। আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ও পূর্ণতা ভালোবাসেন। তাই সালাতকেও পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করি, আসুন।

---

[১] *মাদারিজুস সালিকিন*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৫০, ৪৫১; *নাদারাতুন নাইম*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৮৪৪; কথাগুলো হুবহু বলা না হলেও কাছাকাছি শব্দে বলা হয়েছে।

[২] সুরা হাশর, আয়াত : ২১

আঙুলগুলো আলাদা করে দুই হাতের তালু রাখুন দুই হাঁটুতে।

এরপর হেলানো মাথার উচ্চতা বরাবর পিঠ সোজা করে রাখুন। শান্তভাবে দেহের প্রতিটি অঙ্গকে জায়গামতো আসতে দিন। পড়ুন 'সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ), মহামহিম আমার সুমহান প্রতিপালক।' রব্বি (رَبِّيْ) শব্দটার শেষের ই (ي) সর্বনামের অর্থ আমার। এই কথাটা খেয়াল করুন ভালো করে। ভালোবাসার যে বন্ধন বান্দা ও রবের মাঝে, তারই নির্দেশক এই সর্বনাম। তিনি আমার রব। যত্ন, আচ্ছাদন, আহার্য, সুস্থতা আর মমতা দিয়ে তিনি আমাকে পালন করেছেন। অন্তর দিয়ে উচ্চারণ করা 'সুবহা-না' অর্থ যেকোনো প্রকার ত্রুটি থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

যতবার পড়বেন সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম, ততই বিনীত হতে থাকবে মন। আল্লাহর মহত্ত্ব-বড়ত্ব স্মরণ করুন। অনুধাবন করুন, আপনি আপনারই প্রতিপালকের কাছে সমর্পিত করছেন সব আশা।

সালাতের এই অংশটুকু যান্ত্রিকভাবে পড়ে চলে যাই আমরা অনেকে। আবেগ-অনুভূতির লেশমাত্র মেলে না। অথচ এই রুকু অবস্থানটা আল্লাহর প্রতি দাসত্ব প্রকাশের খুবই নিবিড় এক নিদর্শন। আনুগত্যের নির্যাস এতে নিহিত। সেসময়কার আরবরা এ ব্যাপারে ভালো করেই জানত। তাই এ কাজ করতে প্রত্যাখ্যান করে কিছু অহংকারী ব্যক্তি। এমনকি তাদের পক্ষ থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক সাহাবি অনুরোধ করেছিলেন তারা যেহেতু সালাতে রুকু তথা মাথা ঝুঁকাতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে তাই দাঁড়ানো থেকে সরাসরি সিজদায় চলে যাওয়া যায় কি না! অন্তত সালাতটা পড়ুক তারা।

আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন আলাদা। ভালোবাসার চাহিদা, কিছুক্ষণ একা থাকার ইচ্ছা, কারো কাছে প্রতীক্ষিত হওয়ার বাসনা, সন্তানদের জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর আকাঙ্ক্ষা, কিছু সান্ত্বনার বাণী শোনার কামনাসহ আরো কত কী! এর কোনোটার অভাব ঘটলে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয় আমাদের মাঝে। এমন ভারসাম্যহীন অবস্থা পুরো দিনটিকে প্রভাবিত করে। অজানা কারণে মেজাজ খিটমিটে লাগে। লাগারই কথা, প্রয়োজন পূরণ হয়নি যে!

কিন্তু এর চেয়েও অনেক গুরুতর এক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমাদের মাঝে। এটি ছাড়া পুরোপুরি ভালো থাকা সম্ভব নয়। ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা। এই অভাব পূরণ

করতে যুগে যুগে মানুষ সূর্য এবং সূর্যের নিচে যা আছে, কোনোকিছুর আরাধনা করতে ছাড়েনি। মূর্তি, পানি, পশু, সাপ, সূর্য, বাঁদর, বিজ্ঞান এমনকি নিজের কামনা-বাসনা। অনেক শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করে তারা এর পেছনে। অভাবটা তো পূরণ করতে হবে। কিন্তু সত্য অদ্বিতীয় সত্তার উপাসনার স্বাদ কি আর তাতে মেটে? সেই অভাব পূরণ করে সালাত। রুকু তার অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সালাফগণ রুকুতে এত প্রশান্তি অনুভব করতেন, তিলাওয়াতের সমপরিমাণ সময় এই অবস্থানে থাকতেন। কোনো এক সাহাবি একবার সালাতে এক রাকআতে প্রথম পাঁচটি সুরা একনাগাড়ে তিলাওয়াত করেছেন। তার পাশেই সালাতরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই পুরোটা সময় ছিলেন রুকু অবস্থায়! মানুষগুলো এভাবেই পূরণ করেছেন ইবাদতের চাহিদা।

হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে দেখলেন রীতিমতো তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করছে। রুকু-সিজদা দিচ্ছে যেন ঠোকর মারার মতো করে। তিনি বললেন, তুমি এ অবস্থায় অর্থাৎ এরকম সালাত নিয়ে মারা গেলে সালাতের ব্যাপারে নবিজির দেখানো সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণকারী হয়ে মরবে।[১] তাই রুকু হওয়া চাই শান্ত, ধীর, স্থির—ঠিক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে।

দেখুন, দুনিয়ার জীবন কষ্ট আর ব্যথায় ভরা। এই হাসি, তো এই কান্না। এর দাবিদাওয়া আমাদের তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত করে ছাড়ে। এই তৃষ্ণা মেটাতে সালাতের চেয়ে ভালো আর কী আছে, বলুন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ঠিকমতো রুকু পূর্ণ করে না, সে যেন অনাহারে একটি দুটি খেজুর খাওয়া ব্যক্তির মতো। ক্ষুধা একটুও মেটে না তাতে।[২] তাই আসুন, রুকু-সিজদায় প্রশান্তি খুঁজি।

দিনে কমপক্ষে সতেরোবার আমরা রুকু করি। প্রতিটি বারেই যেন বৃদ্ধি পায় আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা। আপনি তাঁকে সাধ্যমতো ভালোবাসলে তিনি আপনাকে ভালোবাসবেন তাঁর মর্যাদা অনুপাতে। স্রষ্টাই যদি ভালোবাসেন, সৃষ্টির তবে কী সাধ্যি ক্ষতি করার?

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৯; *সহিহ সুনানু নাসায়ি* : ১৩১১

[২] *সহিহুত তারগিব* : ৫২৮

সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তের প্রস্তুতি

সালাতের সুন্দর একটি অংশ রুকু এইমাত্র শেষ করলাম আমরা। রুকু আসলে সিজদার ভূমিকা। রুকু থেকে সিজদায় যাওয়া মানে আনুগত্যের মহৎ এক অবস্থান থেকে মহত্তর, পূর্ণাঙ্গতর আরেকটি অবস্থানে যাওয়া। কিন্তু এর আগে আরেকটি সুন্দর অংশ আছে। রুকু থেকে দাঁড়ানো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দা যদি রুকু এবং সিজদার মাঝে পিঠ সোজা না করে, তাহলে আল্লাহ তার সালাতের দিকে ফিরেও তাকান না।[১] এই গতিহীন, সুস্থির অবস্থানটিরও এত গুরুত্ব যে, হাদিসে এর কথা আলাদা করে এসেছে। পুরো দেহ সোজা করে প্রত্যেক অঙ্গকে জায়গামতো আসার সময় দিতে হবে। কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, নিকৃষ্টতম চোর হলো যে সালাতের মধ্যে চুরি করে।[২] অর্থাৎ, তাড়াহুড়া করে। তাই রুকুর সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন নবিজি।

এবার কিন্তু আল্লাহু আকবার নয়, বলতে হবে 'সামি'আল্লহু লিমান হামিদাহ' (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ), আল্লাহ যেন তাঁর প্রশংসাকারীর জবাব দেন। কেন?

একটু আগেও আমরা কী বলেছি মনে আছে? চাওয়া পূরণ হয়, যদি চাওয়ার আগে যার কাছে চাওয়া হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ তার প্রশংসা করা হয়। সুরা ফাতিহাও এভাবেই গঠিত। একই নিয়ম এখানেও। সালাতের মহত্তম অংশ সিজদায় প্রবেশ করব আমরা একটু পরেই। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম অবস্থান। দুআ কবুলের নিশ্চিত সময়।

তাই 'সামি'আল্লহু লিমান হামিদাহ' আমাদের মনে করিয়ে দেয় সিজদায় কিছু চাওয়ার আগে যথাযথভাবে আল্লাহর প্রশংসা করার কথা। সে উদ্দেশ্যে বলি রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ; হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার তরে সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। এর সাথে যোগ করা যায়—

حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

---

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৮৭১, হাদিসটি সহিহ।

[২] মুসনাদু আহমাদ : ২২৬৪২; সহিহু ইবনি খুযাইমাহ : ৬৬৩; হাদিসটি সহিহ।

হামদাং কাসীরাং ত্বইয়িবাম মুবারাকাং ফীহ

অর্থ : অসংখ্য, সুন্দর ও বরকতময় প্রশংসা তাঁরই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জামাআতে সালাত আদায়কালে রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ বলার পর জনৈক সাহাবি উপর্যুক্ত বর্ধিত অংশটি বলেন। সালাম ফেরানোর পর নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, ওই কথাগুলো কে বলল? সাহাবি বললেন, জি, আমি। নবিজির জবাব, ত্রিশজনেরও বেশি ফেরেশতাকে দেখলাম এর সাওয়াব লেখার জন্য প্রতিযোগিতা করছেন।[১]

আরো একটু আগে বেড়ে বলা যায়—

مِلْءَ السَّمَوَاتِ ومِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

মিলআস-সামাওয়াতি ওয়া মিলআল-আরদ্ব, ওয়া মিলআ মা বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ মা-শি'তা মিং শাইইম বা'দ।

অর্থ : এমন প্রশংসা যা আসমান পূর্ণ করে দেয়, জমিন পূর্ণ করে দেয়, এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু এবং আপনি আরো যা কিছু ইচ্ছে করেছেন, সবই পূর্ণ করে দেয়।

এখানে আরো যা কিছু দিয়ে বোঝানো হচ্ছে মানবজ্ঞানের ও ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরের সব সৃষ্টিকে। যেমন, আরশ-কুরসি ইত্যাদি। এই বাক্যে শুধু স্রষ্টার প্রশংসাই নয়, তাঁর জ্ঞানের তুলনায় নিজেদের জ্ঞানের তুচ্ছতাও স্বীকার করা হচ্ছে অতি বিনয় সহকারে।

হাদিস থেকে এরকম একাধিক যিকির প্রমাণিত থাকায় আরো সুবিধা হচ্ছে। একেক সালাতে একেকভাবে বলে আমরা মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারি। বারবার একই জিনিস অন্যমনস্কভাবে বলতে হয় না।

আসুন, প্রশংসা করেই চলি, করেই চলি। মহান রবের যথাযথ প্রশংসা তো আর সারাজীবনেও করতে পারব না। যতটুকু সাধ্য, তার সবটুকু করতে পারাই সান্ত্বনা। তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা করতে পারেন কেবল একজনই। কে, জানেন? আল্লাহ নিজেই!

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭৯৯

কারণ আল্লাহর এমন এমন সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি রয়েছে, যা আমাদের কল্পনারও অতীত। কোনো মাখলুককে জানানোই হয়নি সেগুলোর ব্যাপারে।

আসল সুখের আকর

রুকু থেকে দাঁড়ানোও হয়ে গেল। এর ফলে আমরা প্রস্তুত হয়ে গেছি সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিটির জন্য। এই সেই অংশ, যা এক এক রাকআতের সুমধুর সমাপ্তি নির্দেশক। এর আগের সবকিছু ছিল কেবল এখানে আসার পথ। সিজদা নামক সাড়ম্বর সমাপ্তির পূর্বকথন মাত্র।

সিজদা আসলে কী? এ কাজটা আমরা অনেকেই রোবটের মতো করে চলেছি বছরের পর বছর। তাই বুঝে উঠতে পারি না এর শক্তিশালী প্রভাব। হৃদয় না লাগালে তো সালাতের কোনো অংশের স্বাদই পাব না আমরা। সিজদা মানে নিজের সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে সম্মানিত জিনিসটিকে চরম লাঞ্ছনার শিকার বানানো। চেহারাকে মাটিতে লুটানো। যেন আল্লাহকে বলা হচ্ছে, হে প্রতিপালক, নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব আপনার কাছে সমর্পণ করে দিলাম।

সত্যিকার সুখের আসল রহস্য এই সিজদা। কীভাবে? নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: চিরসুখের জায়গা জান্নাত কোথায়? সপ্ত আসমানের ওপর, আল্লাহর নিকটে। আর চিরদুর্ভোগের জাহান্নাম? নিচে। আচ্ছা, এবার বলুন জান্নাতের উচ্চতম স্থান কোনটি? আল-ফিরদাউসুল-আলা, যেখানে থাকবেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এরই ছাদ বা উর্ধ্বসীমা হলো আল্লাহর আরশ। আল্লাহর নিকটতম অবস্থান।[১] অন্য কথায়, এখানকার বাসিন্দাদের প্রতিবেশী স্বয়ং আল্লাহ!

আরেকটি ব্যাপার। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় জীবনের কঠিনতম কষ্টের সময় অতিক্রম করছিলেন, আল্লাহ তার কষ্ট লাঘব করতে কী করলেন? তাকে তুলে নিলেন নিজের কাছে। গোটা বিশ্বের ইতিহাসের স্মরণীয়তম ঘটনা : আল-ইসরা ওয়াল-মিরাজ[২]। মানুষের পক্ষে রবের যতটুকু নিকটে যাওয়া

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৭৯০

[২] আল ইসরা শব্দের অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। জিবরিল আলাইহিস সালামের সাথে মক্কার মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নবিজির স্বশরীরে ভ্রমণকে ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় 'ইসরা' বলা হয়। আর

সম্ভব, ওই পর্যন্ত গেলেন নবিজি। এমনকি ইহকালের সুখের উৎস যে নেক কথা ও নেক আমল, সেগুলোও উঠে যায় আল্লাহর কাছে। সেখানেই তাদের স্থান। আল্লাহ বলেন—

...إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ...۝١٠

উত্তম কথা তাঁর দিকে আরোহণ করে এবং সৎআমল তাকে (উত্তম কথাকে) উন্নীত করে।[১]

তাহলে সুখ কোথায়? ওই যে ঊর্ধ্বে আল্লাহর নিকটে। সূত্রটি দাঁড়াল এমন : আল্লাহর যত নিকটবর্তী হবেন, তত বেশি উঁচুতে উঠবে আত্মা, ততই বাড়বে সুখ। সেই সুখের কাছে পৌঁছানোর উপায় তাহলে কী? ওই উচ্চ পর্যায়ের কাছাকাছি যাওয়া। আর সেই উচ্চতায় পৌঁছানোর মাধ্যম? আল্লাহর সামনে নিজেকে নিচু থেকে নিচুতর করা। এ হাদিসটি তো শুনেছেন মনে হয়, যে আল্লাহর কাছে নিজেকে ছোট করে, আল্লাহ তাকে সমুচ্চ করেন।[২] আল্লাহ তাকে উঁচু করেন মর্যাদায়, উন্নীত করেন তার সুখ। এই হাদিসও দেখুন, বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় সিজদা দেওয়ার সময়।[৩] সুরা আলাকের শেষ আয়াতে আল্লাহ কী বলছেন, দেখুন—

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝١٩

সিজদা দিন ও নিকটবর্তী হোন।[৪]

এবার বুঝলেন তো, কী পরিমাণ দামি একটি কাজ এত বছর ধরে করে এসেছেন একেবারে হেলায়-ফেলায়? প্রতিটি সিজদায় আপনি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার

মসজিদে আকসা থেকে ঊর্ধ্বগমনকে বলা হয় মিরাজ।

[১] সুরা ফাতির, আয়াত : ১০

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৮৮; *জামিউত তিরমিযি* : ২০২৯

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৪৮২; *সুনানু আবি দাউদ* : ৮৭৫

[৪] সুরা আলাক, আয়াত : ১৯

চেষ্টা করেছেন। শরীর পড়ে আছে মাটিতে, কিন্তু আত্মা উঠে যাচ্ছে উঁচু থেকে উঁচুতে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, বেশি বেশি সিজদা দিয়ো। কারণ যতবারই কোনো মুসলিম সিজদা দেয়, ততই আল্লাহ জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং গুনাহ মাফ করতে থাকেন।[১] এভাবে করতে করতেই একসময় সে পৌঁছে যায় আল-ফিরদাউসুল-আলায়। যেখানে আল্লাহর আরশ নির্দেশ করে উর্ধ্বসীমা, যেথায় রয়েছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আরো প্রমাণ চাই? রবিআ ইবনু কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওযু করতে সাহায্য করছিলেন। নবিজি বললেন, কিছু একটা চাও।

রবিআর জবাব, জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই।

আর? নবিজির জিজ্ঞাসা।

শুধু এটাই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে বেশি বেশি সিজদা দিয়ে তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে আমাকে সাহায্য করো।[২]

এই যে প্রমাণ পেলেন। আত্মাকে উঁচুতে তুলতে হলে দেহকে ফেলতে হবে নিচে। আর হ্যাঁ, শরীরের সাথে সাথে হৃদয়ও যেন সিজদা করে। সিজদা করে সেই আল্লাহকে, যিনি আরশে অধিষ্ঠিত এবং প্রতিদিন নিত্যনতুন বিষয়ের তত্ত্বাবধানে রত। প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা আর কর্ম তাঁরই কাছে পৌঁছে। সবার তাঁকে প্রয়োজন, তাঁর কাউকে প্রয়োজন নেই। এদিকে এর গুনাহ মাফ করছেন, তো ওদিকে ওর কষ্ট লাঘব করছেন। দুর্বলকে সাহায্য করছেন আর ভাঙা হৃদয়কে জোড়া লাগাচ্ছেন। জীবন দিচ্ছেন আর নিচ্ছেন। যাকে ইচ্ছে, দেখাচ্ছেন সুপথ। যাকে ইচ্ছে, করছেন পথভ্রষ্ট। কোনো জাতিকে অনুগ্রহ করছেন, আবার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিতও করছেন অন্য কোনো জাতিকে। সম্মানিত করছেন, করছেন লাঞ্ছিত। কাউকে সুখী করছেন

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৪৮৮; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৮৮

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৪৮৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৩২০

তো কারো কাছ থেকে সুখ কেড়ে নিচ্ছেন।

এগুলো উপলব্ধি করতে পারবেন, যদি হৃদয় সিজদা করে। কারণ সিজদা থেকে উঠবেন এক বিশেষ নুর সহকারে।

এটি আল্লাহর দয়া ও নুরের চিহ্ন। চেহারায় তা ফুটিয়ে তোলে বিনয় ও দয়াশীলতা। এরকম শান্তি আর সুস্থিরতা আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

সিজদা সালাতের বিশেষ অংশ। কত দুশ্চিন্তাকে যে দূর করে দিয়েছে এই অমূল্য সম্পদ। সমাধা করে দিয়েছে কতই-না সমস্যা, পূরণ করেছে প্রয়োজন। সিজদায় আল্লাহকে বলার আগে কত দুআই-না রয়ে গিয়েছিল নামঞ্জুর!

তাই রবের নিকটবর্তী যদি হতে চান, ছোট হোন আগে। তনু-মন-প্রাণ দিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন। অনুভব করে নিন জগতের সবচেয়ে মিষ্টি স্বাদ। আস্বাদন করুন আসল সুখ।

সুনিপুণ সিজদা

এখনো সালাতের শ্রেষ্ঠতম অংশে আছি আমরা। আচ্ছা, যদি স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদারত অবস্থায় দেখতে পেতাম, তাহলে কত্ত ভালো হতো না? এই দৃশ্যই এখন আমরা দেখব। নবিজিকে সিজদা করতে দেখব নিজেদের সিজদাকে নিখুঁত করার আশায়।

» সিজদায় যাবার কালে অবশ্যই আল্লাহু আকবার বলবেন। আগেও নয়, পরেও নয়। ঠিক নিচে নামতে নামতে।

» সিজদায় কোন অঙ্গ আগে ভূমি স্পর্শ করবে এ বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী মত

[১] সুরা ফাতহ, আয়াত : ২৯

হলো, আগে হাত ও পরে হাঁটুকে মেঝে স্পর্শ করাতে হবে।[১] এক্ষেত্রে পশু বা উটের বসার পদ্ধতির অনুকরণ করা যাবে না।

» তারপর আলতো করে মাটি স্পর্শ করবে মাথা। আস্তে আস্তে মাটিতে দৃঢ়ভাবে বসবে কপাল ও নাক। খেয়াল রাখবেন, যেন কাপড় বা এরকম কিছুর ফলে সিজদার স্থান থেকে কপাল পৃথক না থেকে যায়।[২]

» আঙুলগুলো পরস্পর লেগে থাকবে। হাত-পায়ের সব আঙুল থাকবে কিবলামুখী। হাতের তালুদ্বয় মাথার সমান্তরালেও রাখা যাবে, কাঁধের সমান্তরালেও রাখা যাবে।

» কনুই মাটি স্পর্শ করবে না। পুরুষদের ক্ষেত্রে হাত থাকবে দেহের পার্শ্বদেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে। ঊরু আর তলপেট পরস্পর লেগে থাকবে না।

» দেহের মোট সাতটি অঙ্গ দিয়ে করতে হয় সিজদা। নাকসহ কপাল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু, আর দুই পায়ের পাতা। সুস্থিরভাবে এই অঙ্গগুলো মাটি স্পর্শ করবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এ অবস্থানে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। তবে দুআ করেছেন প্রচুর। তিনি বলেন, বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী

---

[১] দাঁড়ানো থেকে সিজদায় গমনের পদ্ধতি নিয়ে সালাফদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। প্রথমে হাত রাখবে নাকি হাঁটু রাখবে? ইমাম মালিক ও আওযায়ির মতে, সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত রাখবে। তবে অধিকাংশ ফকিহ যেমন হানাফি, শাফিয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফকিহগণ এবং সালাফদের মতানুসারে, সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু রাখবে। ওয়ায়িল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজিকে দেখেছি তিনি সিজদায় যাওয়ার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন এবং সিজদা থেকে ওঠার সময় হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠাতেন। সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে মাটিতে হাত রাখতাম। পরে আমাদেরকে হাঁটু আগে রাখার জন্য আদেশ করা হয়। *সুনানু আবি দাউদ*, ৮৩৮; *সুনানুন নাসায়ি*, ১০৮৯; *সহিহু ইবনি খুযাইমা*, ৬২৬, ৬২৮; *আস-সুনানুল কুবরা*, বায়হাকি, ২৬৩৭; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খণ্ড : ২৪; পৃষ্ঠা : ২০৫, ২০৬

[২] এটি ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর মাযহাব। অপরদিকে হানাফি, মালিকি, ও হাম্বলি মাযহাব এবং অধিকাংশ ফকিহের মত হলো, সিজদার জায়গায় জায়নামাজ বা এ জাতীয় কোনো কিছু বিছানোর দ্বারা কপাল সরাসরি মাটি বা ফ্লোরে ঠেকাতে না পারলে কোনো সমস্যা নেই। যদি তা মাটির সাথে লাগানো থাকে। কেননা খরতাপ এবং কাদা থেকে বাঁচতে নবিজি এবং সাহাবিগণ কাপড় বা পরিধেয়ের বর্ধিত অংশের ওপর সিজদা করতেন। *মুসনাদু আহমাদ*, ২৩৮৫; *সহিহুল বুখারি*, ১২০৮; *সহিহ মুসলিম*, ৬২০; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খণ্ড : ২৪; পৃষ্ঠা : ২০৭-২০৮;

হয় সিজদা অবস্থায়। তাই এ সময়টায় প্রচুর দুআ করো।'[১] তিনি সিজদায় বলতে শিখিয়েছেন, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى), মহামহিম আমার সুউচ্চ প্রতিপালক।[২] তিনবার বা আরো বেশি।

আরো বলা যায়, সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিক, আল্লাহুম্মাগফিরলি (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ); মহামহিম আপনি, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক, আপনার প্রশংসা করি, আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ।[৩] আরো বলতে চাইলে, সুব্বূহুন কুদ্দূসুন, রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ (سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ والرُّوْحِ); মহামহিম ও মহাপবিত্র তিনি, ফেরেশতা ও রূহের (জিবরিলের) প্রতিপালক। আর সিজদায় করণীয় দুআ তো শিখিয়েছেন অগণিত। প্রত্যেকটির আলাদা অর্থ, অনন্য স্বাদ। মনোযোগ বৃদ্ধির হাতিয়ার একেকটি।

দুআ করা মানে আল্লাহর সাথে কথোপকথন। যার প্রতি যত ভালোবাসা, তার সাথে কথা বলার তত সাধ। ততই তার সঙ্গ লাভের ইচ্ছে। সুরা ত-হা'র এগারোতম আয়াত খুলে দেখুন। সিনাই পর্বতের তুওয়া উপত্যকায় আল্লাহ কথা বলেছেন মুসা আলাইহিস সালামের সাথে। তন্ময় হয়ে আল্লাহর কথা শুনছিলেন মুসা। হঠাৎ যখন প্রশ্ন এল, তোমার ডান হাতে কী, মুসা? প্রিয় প্রতিপালকের সাথে কথা বলার এ সুযোগ মুসাকে এতই আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, তিনি একনাগাড়ে বলতে থাকেন, এটা আমার লাঠি। আমি এতে হেলান দিই। এটা দিয়ে আমার ভেড়ার পালের জন্য পাতা ছিঁড়ি। কথার মাঝে যেন হারিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। অকস্মাৎ মনে পড়ল, আল্লাহর মর্যাদার সাথে পাছে বেয়াদবি হয়! তাই তাড়াতাড়ি কথা সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন, 'এছাড়া আরো অনেক কাজ করি এ দিয়ে।'

সিজদায় গিয়ে তাই মুসা আলাইহিস সালামের সেই আনন্দটি অনুভব করার চেষ্টা করুন। স্মরণ করুন আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসার কথা। কথা বলুন তাঁর সাথে। তাঁর প্রশংসা করুন, তাঁর কাছে চান। নিজের সব বোঝা নামিয়ে দিন তাঁর দ্বারে। খুঁজে নিন সেই শান্তি, যা একমাত্র তিনিই দিতে সক্ষম।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৪৮২; *সুনানু আবি দাউদ* : ৮৭৫

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৫১৪ হাদিসের সনদ সহিহ।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৮১৭; *সহিহ মুসলিম* : ৪৮৭

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ্যউযু বিরিদ্বাকা মিন সাখাতিক, ওয়া বিমুআ-ফা-তিকা মিন উকূবাতিক, ওয়া আ্যউযু বিকা মিংকা, লা উহসী সানাআন আলাইকা আংতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই, আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই, আপনার কাছ থেকে আপনারই কাছে আশ্রয় চাই, আপনার প্রশংসা করতে আমি অক্ষম, আপনি নিজেকে নিজে যেভাবে প্রশংসা করেছেন, ততটাই প্রশংসিত আপনি।[১]

সালাতের প্রতি রাকআতে একটি করে রুকু, কিন্তু সিজদা দুটি। কেন? সিজদা সালাতের এতই গুরুত্বপূর্ণ রুকন যে, তা দুইবার করা হয়। একবার যেন যথেষ্ট নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদাকে অনেক লম্বা করতেন। আল্লাহর সাথে অমূল্যতম সময়গুলোকে উপভোগ করে নিতেন পুরোপুরি। তার নাতিদের জন্যও অবশ্য এ সময়টা বেশ মজার ছিল। তাদের উট-উট খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তুলতেন না নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হৃদয় নিংড়ানো ফরিয়াদ

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম, সালাতের প্রতিটি অংশের রয়েছে বিশেষ অর্থ ও অনন্য গুরুত্ব। একেকটি অবস্থান যেন একেকটি নতুন জগৎ। এই বৈচিত্র্যের ফলে মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়, একঘেঁয়েমি আসে না। পুরো সালাত জুড়ে অন্তর থাকে সজীব। হৃদয়ে চলতে থাকে নানা রকম অনুভূতি ও আবেগের কুচকাওয়াজ—আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আশা, ভয় ও বিনয়।

এবারের অবস্থানটি প্রচণ্ড বিনয় ও ভীতি উদ্রেককারী। কারণ বিচারদিবসের অবস্থানের সাথে এর মিল রয়েছে।

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১১১৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৮৭৯

يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

মানুষকে সেদিন দেখবেন নতজানু। প্রত্যেক জাতিকে ডাকা হবে তাদের হিসাব-নিকাশের প্রতি। আজ তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে তোমাদের প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য। আমার (নিকট সংরক্ষিত) এ আমলনামা যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য বলবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা করেছ, তার সবই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি।[১]

এই দুনিয়ায় এরকমভাবে বসে নিজের ব্যাপারে রায় শোনে আসামি। এই অবস্থায় প্রাণপণে আকাঙ্ক্ষা করা হয় ক্ষমার, অপেক্ষা করা হয় একজন উদ্ধারকারীর। আর তা হলো দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক।

এসময় কোন কথাটি বলা সবচেয়ে জরুরি? অতি অবশ্যই রব্বিগফিরলী (رَبِّ اغْفِرْ لِيْ); হে প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করে দিন। দুই, তিন, চার বা আরো বেশি বার। জীবনে তো আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করেছি অসংখ্যবার। তাই অসহায়ত্বের এই অবস্থানে একবার যখন বসেছেন, যত পারেন মাফ চেয়ে নিন। সিজদার সমপরিমাণ সময় এ অবস্থানে বসতেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বলতেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ

আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়াজবুরনী ওয়া 'আফিনী ওয়ারযুকনী ওয়ারফা'নী।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, সুপথে চালান, সমৃদ্ধ করুন, সুস্বাস্থ্য দিন, রিজিক দিন, আমার মর্যাদা উঁচু করুন।[২]

বিচারদিবসে মাখলুক যখন ভয়ার্ত অবস্থায় নিজের রায় শোনার অপেক্ষায় থাকবে, তখন আল্লাহর আরশের সামনে সুদীর্ঘ সিজদায় পড়ে থাকবেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রশংসা, প্রার্থনা ও কান্নায় রত থাকবেন, কাঁদবেন নিজের উম্মাহর জন্য। যতক্ষণ না আল্লাহ বলেন, মাথা তুলুন, মুহাম্মাদ। চেয়ে নিন, মঞ্জুর

---

[১] সুরা জাসিয়াহ, আয়াত : ২৮-২৯

[২] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৮৪; *সুনানু আবি দাউদ* : ৮৫০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৮৯৮; হাদিসটি সহিহ।

করা হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে। সিজদা থেকে মাথা তুলে নবিজি আমাদের জন্য সুপারিশ করা শুরু করবেন। এ থেকে বোঝা যায়, সিজদায় যেমন দুআ কবুল হয়, তেমনি এ থেকে ওঠার পরও কবুল হয়।[১]

ক্ষমা চাইতে চাইতেই আমরা প্রস্তুতি নিই দ্বিতীয় সিজদার। প্রতিপালক আল্লাহর নৈকট্য লাভের তৃষ্ণা তো কখনোই পুরোপুরি ঘোচে না। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সুরা আলাক শুরু হয় কিরাআত (পড়ো) দিয়ে আর শেষ হয় সিজদা দিয়ে। ঠিক যেভাবে সালাতের রাকআত শুরু ও শেষ হয়।

তাই প্রতিটি ইবাদতের আছে বিশেষ সৌন্দর্য ও অনন্য স্বাদ। যতই শিখব, ততই আস্বাদন করতে পারব সেগুলো। যত যা-ই হোক—

...هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ...﴿٩﴾

যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?[২]

বিদায়বেলা

এক রাকআত শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠুন। আগেরবার মনোযোগের ঘাটতি হয়ে থাকলে এবারই তা পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ। এবার যেন আর বিনয়-একাগ্রতায় কোনো ত্রুটি না হয়।

আর যদি শেষ রাকআতে চলে এসে থাকেন, তবে তো এটিই বিদায়বেলা। বান্দা ও দয়াময় রবের মাঝে অনিন্দ্যসুন্দর সাক্ষাতের সুমিষ্ট সমাপ্তি। আমরা পৌঁছে গেছি তাশাহহুদে।

হাত রাখতে হবে হাঁটুতে অথবা তার ঠিক ওপরে উরুতে। পুরো সাক্ষাতের মতোই শেষ বৈঠকও শুরু হবে আল্লাহর প্রচুর প্রশংসার মাধ্যমে। তাঁর চিরন্তন অস্তিত্ব, ত্রুটিহীনতা ও সার্বভৌমত্বের মহিমাকীর্তন করে। তাঁকে সরাসরি অভিবাদন জানিয়ে

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭৪১০; *সহিহ মুসলিম* : ১৯৩

[২] সুরা যুমার, আয়াত : ৯

কথা বলুন গভীর সুন্দর কিছু শব্দে, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ), সকল তাহিয়্যাত (অভিবাদন-প্রশংসা-কীর্তন) শুধু এবং শুধুই আল্লাহর জন্য, আর কারো জন্য নয়।

ওয়াস্‌সলাওয়াতু (وَالصَّلَوَاتُ), আর আমাদের সকল দুআ ও সালাত তাঁর কাছে। ওয়াত্‌ত্বয়্যিবাতু (وَالطَّيِّبَاتُ) , আর সকল ভালো প্রচেষ্টা (কথা-কাজ) শুধু তাঁর জন্য। কারণ আল্লাহ শুধু উত্তম, পবিত্র ও একনিষ্ঠ জিনিসই কবুল করেন।

এরপর যে কথাগুলো বলবেন, সেগুলো পাহাড়সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য এক ভূখণ্ডে চলে যাবে। হাজার ক্রোশ দূরে একেবারে মদিনায়, যেখানে শায়িত আছেন আমাদের প্রিয় নবিজি। 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়ারহমাতুল্লহি ওয়াবারাকাতুহ' (اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ); আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, দয়া ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক আপনার প্রতি, হে নবি; প্রতিদিন যতবার আপনি এই বিশেষ অভিবাদন পাঠান, ততবার এর জবাব দেন তিনি। এ হাদিসটি দেখুন: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখনই কেউ আমার প্রতি সালাত ও সালাম পাঠায়, তখনই আল্লাহ আমার রুহ ফিরিয়ে দেন যাতে তার ফিরতি সালাত ও সালাম জানাতে পারি।[১]

এই মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে কাছে যে দরজাটা আছে, সেদিকে তাকান। মনে করুন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইমাত্র প্রবেশ করছেন সেটা দিয়ে। নুরানি সুন্দর চেহারা, পরিপাটি করে বাঁধা পাগড়ি, সুগন্ধময় ধবধবে সাদা পোশাক। হৃদয়গলানো উষ্ণ হাসি ঠোঁটে। আজ তিনি একজনেরই সালামের জবাব দিতে এসেছেন, আর সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি হলেন আপনি! কেমন লাগবে তখন? কী বলবেন তাকে? উত্তেজনার বশে হয়তো মুখ দিয়ে কথাই বেরুবে না। অথচ ওপরের এই ভালোবাসাময় শব্দগুলো দিয়ে আপনি ঠিক এভাবেই রাসুলুল্লাহর সাথে কথা বলেন আর এই বিরল সম্মান আপনি পাচ্ছেন দিনে কমপক্ষে নয়বার!

কতজনেরই না ইচ্ছে হয়, ইশ! যদি নবিজির সাথে একই যুগে বাস করতে পারতাম। তাকে সরাসরি দেখতে পারতাম। ওপরের কথাগুলোর মাধ্যমে আমাদের এই ইচ্ছেরই বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাই প্রিয়নবিকে হৃদয় নিংড়ানো আবেগ সহকারে

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২০৪১; হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

অভিবাদন জানাই, আসুন। যে অমূল্য আসমানি বার্তা তিনি এনেছেন, তার যথাযথ কৃতজ্ঞতা জানাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার কথা তো স্মরণ করবেনই। তার পাশাপাশি মনে রাখবেন, আমরা এখন রাসুলুল্লাহর স্রষ্টা সেই অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহর সামনে। তাঁর প্রিয়পাত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিবাদন ও সালাম জানাচ্ছেন দেখে আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিলেন তারও দশগুণ রহমত-বরকত!

আল্লাহ ও নবিজির পর আমরা এবার সালাত ও সালাম পাঠাব নিজেদের প্রতি। সেইসাথে আল্লাহর সকল সৎকর্মশীল দাসের প্রতি।

'আসসালামু আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সলিহীন' (اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ), 'শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সকল নেককার বান্দার ওপর।' হোক সে বান্দা জমিনের অধিবাসী বা আসমানের, মানুষ বা ফেরেশতা।

এরপর তাওহিদের সেই শক্তিশালী বাণী দিয়ে নবায়ন করব আমাদের ঈমান ও ইখলাস।

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وِأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ); আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে যাবে।[১] তাই ওপরের কথাগুলো রীতিমতো জান্নাতের টিকিট।

অবশেষে চমৎকার এই সাক্ষাৎ যখন সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে, এ সময় দুআ কবুল করা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। তাই প্রথমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি দরুদ পড়ে নিন। তারপর পড়ুন হাদিসে আসা বিভিন্ন দুআ, যেখানে আমাদের প্রতিটি প্রয়োজনের কথাই বলা হয়েছে।

তারপর ডানে-বামে ফিরে দুইবার সালাম দিন আপনার সাথের ব্যক্তিদের। এসময় আপনার এক গভীর প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতার অনুভূতি হওয়া চাই। যদি না হয়, তাহলে

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩১১৬; হাদিসটি সহিহ।

বুঝতে হবে আপনার হৃদয় স্থবির হয়ে গেছে। এটি আপনারই বদ আমলের প্রভাব। এর ফলে রবের সাথে সৃষ্টি হয়েছে আপনার দূরত্ব। অন্তরের ত্রুটির জন্য সালাত শেষে তাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, কমপক্ষে তিনবার। তারপর উঠে দাঁড়ান সুন্নাত সালাত আদায়ের জন্য। আল্লাহপ্রদত্ত শান্তি উপভোগের এটি আরো একটি সুযোগ। আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসা যত বাড়বে আর যতই তাঁর নৈকট্য লাভ করবেন, আপনার অন্তর ততই হয়ে উঠবে বিনয় ও একাগ্রতায় সজীব। এটা সবসময় মনে রাখবেন। ফলে বাড়বে আপনার মনোযোগ। আস্বাদন করতে পারবেন সালাতের সত্যিকার সৌন্দর্য।

শেষকথা

সালাতের গুরুত্ব কত বেশি এতক্ষণে হয়তো একটু হলেও বুঝে এসেছে। আরো ভালো করে বুঝতে আলি রাযিআল্লাহু আনহুর অবস্থা মনে করতে পারি। সালাতের সময় হলে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। ভয়ে কাঁপতে থাকতেন তিনি। বলতেন, এমন এক আমানত রক্ষার সময় এসেছে, যা একসময় আসমান, জমিন ও পাহাড়কে নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা নিতে অপারগতা জানিয়ে দেয়। এই আমি (মানুষ) অভাগা সেটা নিয়ে নিলাম।[১] এই আমানত হলো স্বাধীন ইচ্ছার দায়ভার। ভালো ও মন্দের মাঝে ইচ্ছেমতো বেছে নেওয়ার ক্ষমতা।

আখিরাতে সবার আগে হিসাব নেওয়া হবে সালাতের। এটি ঠিকঠাক থাকলে বাকি সব হিসেব হয়ে যাবে সহজ। এতে সমস্যা থাকলে কঠিন হয়ে যাবে পুরো হিসেব।[২] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে সালাত ত্যাগ করল সে কুফরি করল (কাফার)।[৩]

সালাত কিন্তু আমরা শুধু বাধ্যবাধকতার কারণেই পড়ব না। এতে নিয়ত অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা সময় মানুষ বাঁচার জন্য খেতো। আর এখন খাওয়ার জন্য বাঁচে। খাওয়া যেন এখন একটি শিল্প। কত যে রান্নাপদ্ধতি, পরিবেশনের ঢং আর সমন্বয়ের রং। প্রতিটি কামড়ে যেন পাওয়া যায় আলাদা

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৭২; হিলয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩৩

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৮৬৪; *জামিউত তিরমিযি* : ৪১৩; হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ২৬২১; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪৬৩; হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

আলাদা স্বাদ। সালাতও হওয়া উচিত এরকম। সালাত পড়বেন, কারণ আপনি তা ভালোবাসেন। এর স্বাদ নিতে চান আপনি।

আগেভাগে প্রস্তুতি নিন। ঠিক যেমন মূল খাবারের আগে আসে রুচিবর্ধক। আজান শোনার পর থেকেই শুরু হবে আপনার সালাত। আগের ওয়াক্তের ওযু থাকলেও আবার করে নিন। নিজের নুর বাড়ান। সচেতনভাবে নিজেকে প্রশ্ন করুন, কী করতে চলেছি এখন? কার সাথে সাক্ষাৎ করব? কোনোমতে সতর ঢাকা যায়—এমন পুরনো কাপড় বেছে না নিয়ে নিজের সাধ্যের সেরাটা নিন। জগতের অধিরাজের সাথে দেখা করতে যান সুন্দর কিছু পরে। বন্ধ করে দিন ফোন। জায়নামাজ যেন হয় সাদামাটা, আল্পনাহীন। কিবলামুখী হোন। জামাআতে আদায় করলে সোজা করে নিন কাতার। চেষ্টা রাখুন প্রথম কাতারে জায়গা পাওয়ার।

এই সেই সালাত, ইবাদতের সুন্দরতম পদ্ধতি। এক প্রশান্তি আনয়নকারী, তৃষ্ণা নিবারণকারী। দেহ থাকে মাটিতে, আত্মা ভেসে যায় রহমানের আরশে। সালাত মানুষের প্রতি আল্লাহর পাঠানো উৎকৃষ্ট উপহারগুলোর একটি। এরকম শান্তি আর সুখই তো খুঁজে বেড়াই আমরা। এই কষ্ট, দুঃখ, বেদনা ও ব্যথায় ভরা জীবনে আল্লাহই তো উপশমদাতা। আর সেই উপশম তিনি দেন সালাতের মাধ্যমে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

হে বিশ্বাসীগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[১]

দুশ্চিন্তাকালে সালাতের সময় হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলতেন, মনে আছে? আমাদের প্রশান্তি দাও, বিলাল।[২]

এই প্রশান্তি শুধু নেককার পূর্বসূরিদের একচ্ছত্র মালিকানা নয়। আমরা সাধারণ মানুষেরাও পারব সালাতের রহস্যের তালা খুলতে। এর মানে শুধু মনোযোগ-একাগ্রতা বৃদ্ধির চেয়েও বেশি কিছু।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৩;

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৮৫; হাদিসটি সহিহ।

হৃদয়ের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ : সালাতকে অনুভব করতে হলে অন্তরকে সালাতে মগ্ন রাখতে হবে। এ কোনো কঠিন কাজ নয়। স্রেফ দশটা মিনিট আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসা নিয়ে ভাবুন। ভুলে যান দুনিয়াকে। ওসবের জন্য আরো তেইশ ঘণ্টা সময় পাবেন। এই দশটা মিনিট শুধু উপভোগ করুন আল্লাহর নৈকট্যের শান্তি ও আনন্দ।

সালাতের কাজ ও কথাগুলোর উপলব্ধি : কী করছি, কী বলছি, তা বুঝতে পারলে মনোযোগ অটুট থাকে। আল্লাহ যেহেতু মনোযোগ দিয়ে সালাত আদায়ের আদেশ করেছেন, তার মানে তা আমাদের সাধ্যের মধ্যেই আছে। সালাতে যে শুধু একাগ্র অংশটুকুরই সাওয়াব পাওয়া যায়, জানেন? দুই ঘণ্টার মুভি দেখতে বা পরীক্ষা দিতে তো আমরা মনোযোগ হারাই না। আর যে আল্লাহর উপাসনা করে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস, তাঁর প্রতি দশটা মিনিট মন দিতে পারব না? আল্লাহর কাছে সাহায্য চান কেবল। এত সাহায্য চান, যেন একসময় গিয়ে ইচ্ছে হয় অনন্তকাল ধরে সালাত আদায় করার।

আশা নিয়ে আগমন : আশা এক গভীর আবেগ, যা পুরো সালাতে উপস্থিত থাকা চাই। আল্লাহর ব্যাপারে যত জানবেন, আপনার অন্তর ততই আশা করবে আল্লাহর দয়া, ক্ষমা, স্বীকৃতি, ভালোবাসা ও নৈকট্য। আশা আর ইচ্ছা কিন্তু আলাদা জিনিস। আশা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। তাই আল্লাহর রহমতের আশা নিয়ে তাঁর কাছে তা চান।

...ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...﴿٦٠﴾

আমাকে ডাকো। আমি সাড়া দেবো।[১]

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করেন। তিনি তো সদা ক্ষমাশীল, দয়াময়। [সুরা যুমার, আয়াত : ৫৩]

[১] সুরা গাফির, আয়াত : ৬০

আল্লাহর মহব্বত ও বড়ত্ব অনুভব : গভীর ভালোবাসা-ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত সমীহের অনুভূতি হওয়া চাই আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সময়। এই অনুভূতির নাম হাইবা বা বড়ত্ব। অনেকটা যেমন পিতামাতা বা কোনো কর্তৃপক্ষের ব্যাপারে অনুভূত হয়, সেরকম। হাইবা হলো ভয়ের উচ্চতম পর্যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআগুলো আমাদের মাঝে তাঁর বড়ত্ব ও ভয় জাগ্রত করে যেমন, আপনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। আপনার পাকড়াও থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই আপনি ছাড়া[১]। এমনও ফেরেশতা আছেন, যারা সৃষ্ট হওয়ার পর থেকে শুরু করে, একদম কিয়ামত পর্যন্ত সিজদাতেই লুটিয়ে থাকবেন। তারপরও তারা আল্লাহর উদ্দেশে বলবেন, সুমহান আপনি, আমরা যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করতে পারিনি।

যতই আল্লাহকে জানবেন এবং সে তুলনায় নিজের তুচ্ছতা উপলব্ধি করবেন, ততই আপনার অন্তরে বাড়বে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব। সবকিছুই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে। আমরা তাঁর আদেশ অমান্য করার কে?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝١٣

তোমাদের কী হলো যে, আল্লাহর বড়ত্বের ব্যাপারে সচেতন হচ্ছ না?[২]

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٦ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝١٧

...তিনি চাইলেই তোমাদের সরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন নতুন এক সৃষ্টি। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।[৩]

মিরাজের রাতে আল্লাহর প্রতি জিবরিল আলাইহিস সালামের যে শ্রদ্ধা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন, সে ব্যাপারে তিনি বলেন, জিবরিল যেন উটের পিঠের পুরনো কাপড়ের মতো হয়ে গেছেন আল্লাহর ভয়ে।[৪]

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৩৯৪; হাদিসটি হাসান।

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৩

[৩] সুরা ফাতির, আয়াত : ১৬-১৭

[৪] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৪৬৭৯; *সহিহুল জামি* : ৫৮৬৪; হাদিসটি সহিহ।

ভালোবাসা : আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা নিয়ে সালাতে প্রবেশ করুন। কারণ তাঁর সৌন্দর্য, আপনার প্রতি তাঁর দয়াশীলতা এবং অনুগ্রহের কোনো শেষ নেই।

লজ্জাবোধ : আমরা এত এত গুনাহ করার পরও আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বন্ধ করেন না। ধৈর্য নিয়ে আমাদের রক্ষা করে চলেন আমাদের সব সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও। আল্লাহ বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢

নিশ্চয়ই মুমিনরা সফল, যারা তাদের সালাতে বিনয়-নম্র।[১]

সালাতের এই রহস্যগুলো আপনাকে খুশু অর্জনে সাহায্য করবে। এ দুনিয়ায় সালাতের মিষ্টতা অনুভব ও আখিরাতে এর প্রতিদান পাওয়ার জন্য যে বিনয় ও একাগ্রতা প্রয়োজন, তাকে খুশু বলে। সালাতের এই খুশু কেড়ে নিতেই শয়তান সদা তৎপর। তাই তো সালাত শুরু করতেই মনে পড়ে যায় দুনিয়ার তাবৎ অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম। চোর কখনো রাজপ্রাসাদে হানা দেয় না, কারণ তা কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত। গরিবের ঘরেও যায় না, কারণ তা খালি। সে ছোঁকছোঁক করে বড়লোকের ঘরে, যেখানে সম্পদ থাকলেও প্রহরী নেই। আপনিও তা-ই। আপনি ধনী, কারণ আপনার খুশু আছে। কিন্তু তার জন্য নেই সর্বোচ্চ মানের নিরাপত্তাব্যবস্থা। তাই শয়তান বারবার মন সরিয়ে দিয়ে আপনার সালাতের দাম কমিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এতক্ষণ ধরে যা জানলেন, তা প্রয়োগ করলে এই বাধা-বিপত্তিগুলো টপকানো সহজ হবে। দেখার মতো উন্নতি হবে আপনার সালাতের।

এবার বলুন তো, কোন মাসে সবচেয়ে ভালো খুশু থাকে? রামাদানে, তাই না? রামাদানের বিশেষত কোন সময়? অবশ্যই তারাবিহ। এ সময়টাতেই চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সারা মসজিদ জুড়ে থাকে ডুকরে ডুকরে কান্নার আওয়াজ। কী এমন বিশেষত্ব এই ইবাদতের? কারণ ওই মুহূর্তেই সত্যিকার অর্থে অনুভূত হয়, আপনি কোন সত্তার সাথে কথা বলছেন। উপলব্ধি হয় আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের।

---

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২

এই অমূল্য মুহূর্ত ও প্রকৃত খুশু যেন বছরে একবারই না আসে; বরং আসে প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তের সালাতে। নিজের সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করুন আল্লাহর সাথে কথা বলার, তাঁকে সম্বোধন করার, আলাপচারিতা করার ব্যাপারটি। সালাত কেবল একজনের বকবক নয়। এটি সংলাপ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংলাপ। প্রাণ দিয়ে অনুভব করুন সংলাপের অন্য প্রান্তের সত্তাকে।

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

আমাদের সেরা কিছু বই

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক
০১	এবার ভিন্ন কিছু হোক	আরিফ আজাদ
০২	অবাধ্যতার ইতিহাস	ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি
০৩	পড়ো ৩	ওমর আল জাবির
০৪	কুরআনের শব্দ শিক্ষা : ১	উস্তায এস. এম. নাহিদ হাসান
০৫	শেষরাত্রির গল্পগুলো	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
০৬	জবাব ২	মুশফিকুর রহমান মিনার
০৭	প্রত্যাবর্তন ২	সমকালীন টীম
০৮	বিলিয়ন ডলার মুসলিম	খুররাম মালিক
০৯	হাদিস সংকলনের ইতিহাস	ড. মুস্তফা আল-আযমি
১০	ইজ মিউজিক হালাল?	ড. গওহর মুশতাক
১১	আরবি রস (দ্বিতীয় খণ্ড)	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
১২	কেন আমরা ব্যবসা করব?	শাইখ তাওফিক চৌধুরি
১৩	সিরাজাম মুনির	আরিফুল ইসলাম

আমাদের অন্যান্য সেরা গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
০১	জীবন যেখানে যেমন	আরিফ আজাদ	২৬০
০২	নবি-জীবনের গল্প	আরিফ আজাদ	২৪৩
০৩	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ	৩১৫
০৪	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৭০
০৫	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৬	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৫৮
০৭	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩৩০
০৮	সুখী পরিবার নির্মাণের রূপরেখা	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৭৫
০৯	সন্তান গড়ার কার্যকরী কৌশল	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৪৫
১০	পারিবারিক সম্পর্কের বুনন	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৩০
১১	সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালের মনস্তত্ত্ব	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৬৫
১২	শিশুদের সমস্যা আমাদের করণীয়	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৭৫
১৩	সন্তানকে বইমুখী করার কৌশল	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৪৫
১৪	কে উনি?	মোহাম্মাদ তোয়াহা আকবর	১৭২
১৫	ওপারেতে সর্বসুখ	আরিফুল ইসলাম	১৯০
১৬	আরবি রস	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৮৬
১৭	জবাব	মুশফিকুর রহমান মিনার	৩৩০
১৮	ভ্রূণের আর্তনাদ	শাহিনা বেগম	১৬৮
১৯	আকিদাতুত তাহাবি [ব্যাখ্যাগ্রন্থ]	শাইখ আব্দির রহমান আল-খুমাইস	২৪৫
২০	প্রোডাক্টিভিটি লেসনস	শাইখ মাশআল আব্দুল আজিজ	১৫২
২১	সূরা ইউসুফ:পবিত্র এক মানবের গল্প	শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
২২	বিষয়ভিত্তিক বিশুদ্ধ হাদিস	শাইখ ড. আওয়াদ আল-খালফ	৫১৫
২৩	শিকড়ের সন্ধানে	হামিদা মুবাশ্বেরা	৪৩০
২৪	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩৪৬
২৫	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৩২

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
২৬	ইমাম আবু হানিফা ﵀	আবুল হাসানাত	২৫৫
২৭	ইমাম শাফিয়ি ﵀	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মামুন	২৪৩
২৮	ইমাম মালিক ﵀	আব্দুল্লাহ মাহমুদ	২৪৩
২৯	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀	যোবায়ের নাজাত	২৫৫
৩০	হাসান আল-বাসরি ﵀	আব্দুল বারী	১৭৫
৩১	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀	আবুল হাসানাত	২৬৫
৩২	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
৩৩	তিনিই আমার রব (দ্বিতীয় খণ্ড)	শাইখ ড. রাতিব আন-নাবুলুসি	২৬০
৩৪	তিনিই আমার প্রাণের নবি	শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
৩৫	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৭৮
৩৬	রিক্লেইম ইয়োর হার্ট	ইয়াসমিন মুজাহিদ	২৫০
৩৭	পড়ো-১	ওমর আল জাবির	২২০
৩৮	পড়ো-২	ওমর আল জাবির	২৮০
৩৯	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
৪০	ফেরা-২	বিনতু আদিল	১৭২
৪১	বিশ্বাসের জয়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	২৬৮
৪২	অশ্রুজলে লেখা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	২৭৫
৪৩	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
৪৪	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
৪৫	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	১২৫
৪৬	হাইয়া আলাস সালাহ	শাইখ আবু আব্দিল আযিয আল-জাযায়িরি	১৭৫
৪৭	ভালোবাসার রামাদান	ড. আয়িয আল-কারনী	৩০৮
৪৮	সেরা হোক এবারের রামাদান	রৌদ্রময়ী টীম	২৬০
৪৯	জিলহজের উপহার	আব্দুল্লাহিল মা'মুন	১৪০
৫০	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়ুম আস-সুহাইবানী	১৪১
৫১	সবর	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	২৬০
৫২	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	৩২০

শাইখ মিশারি আল-খাররাজ একজন কুয়েতি ইমাম, খতিব ও দাঈ। ১৯৮৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কুয়েত ইউনিভার্সিটিতে শারিয়াহ বিভাগে উচ্চতর পড়াশোনা করেন। খুশুখুযু এবং সালাতে মধুরতা লাভের উপায় সম্পর্কিত দারসের মাধ্যমেই সবার নজরে আসেন তিনি। উল্লেখিত দারস তিনি প্রদান করেন কুয়েতের কেন্দ্রীয় ও সর্ববৃহৎ মসজিদে। আর এই দারস থেকে হাজারো মানুষ উপকৃত হয়। পরে আরব-বিশ্বের সর্বপ্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান MBC তার এই দারস সরাসরি সম্প্রচার করে, যা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা কুড়ায়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তার সেই দারসেরই সরল অনুবাদ।

সমকালীন প্রকাশন

খুশুখুযু হলো সালাতের প্রাণ। খুশুখুযুহীন সালাত যান্ত্রিক ওঠাবসা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের সালাত থেকে খুশুখুযু হারিয়ে গেছে। ফলে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে সালাতের সেই প্রভাবও। উদাসীনতার অতলে হারিয়ে যাওয়া সেই খুশুখুযু ফিরিয়ে আনতেই আমাদের এবারের পরিবেশনা। সালাতের প্রতিটি পর্বে খুশুখুযু ধরে রাখার অব্যর্থ সব কলাকৌশলে সমৃদ্ধ 'হৃদয়জুড়ানো সালাত' বইটি। এ বই পাঠের পর আমাদের সালাতে আসবে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, ইনশাআল্লাহ।

বিক্রয়কেন্দ্র :
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০